মোহাম্মদ
মামুনুর রশীদ

অমীতো মোর্শেদ মহান

তুমিতো মোর্শেদ মহান

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

বিশ শতকের বিস্ময়কর বুজুর্গ
হজরত হাকিম আবদুল হাকিম (রহঃ) এর
জীবনালেখ্য–

তুমিতো মোর্শেদ মহান

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

প্রকাশক
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ

১ম প্রকাশঃ জানুয়ারী, ১৯৮৭ ইং
৭ম প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ ইং

প্রচ্ছদ
আব্দুর রোউফ সরকার

মুদ্রণ
শওকত প্রিণ্টার্স
১৯০/বি, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০।
মোবাঃ ০১৭১১২৬৪৮৮৭, ০১৭১৫৩০২৭৩১

বিনিময় ঃ আশি টাকা মাত্র

TUMITO MORSHED MOHAN, the life sketch of Imamul Awlia Hazrat Hakim Abdul Hakim (Rh.) written by Mohammad Mamunur Rashid in Bengali & Published by Hakimabad Khanka-e-Muzaddedia.

Exchange Tk. 80/- US $ 10.00

ISBN 984-70240-0036-1

ঝড়ে উড়ে গেলে ঘর নিরাশ্রয় জনতা যেমন
হতবাক হয়ে দেখে পৃথিবীর অসহায় রূপ;
ফেলে আসা কাফেলার যাত্রীদল হয়েছে তেমন
তোমার বিরহে বন্ধু, শত বুক ভস্মীভূত ধুপ।

স্মৃতির সাগরে ভেসে ভাবনার অনিশ্চিত তরী
কতোবার যাত্রা করে, কতোবার খোঁজে আশ্রয়
দিক চিহ্ন মুছে ফেলে যায় কতো দিন বিভাবরী
বিরান বাগানে হয় শুধু দুঃখ ব্যথা সঞ্চয়।

জানি এই যাওয়া আসা অদৃষ্টের চিরন্তর রীতি
যেমন গিয়েছ তুমি সেরকম যায় সকলেই
রোদনের রূপে জ্বলে অগণিত সেতারার স্মৃতি
বিরহ মিলনে ঘেরা জীবনের মূল মানে এই।

তোমার কাহিনী লিখি, হে মাশুক মোর্শেদ মহান
যে নিশান দিলে হাতে তাই নিয়ে চলি ক্রমাগত
কে পথিক পথ চাও, কে প্রেমিক পিপাসিত প্রাণ?
ডাক দিয়ে যাই এসো প্রেম-পথে হই অবনত।

তার রূপে মত্ত হই যার তুল্য নাই কোন খানে
এসো ধরি রসূলের রক্তরাঙ্গা সেই শুভ পথ
মোর্শেদের কাছে আছে অনন্ত সে জীবনের মানে
যে জীবনে মেলে ডানা শান্তির সহস্র কপোত।

প্রথম প্রকাশের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্পাকের জন্য এবং তাঁর নির্বাচিত বান্দাগণের প্রতি সালাম।

মানুষ নিরাপত্তা চায়। সব মানুষই শান্তিকামী। শান্তির জন্য মানুষের এই আর্তি যতোই বিশুদ্ধ হোক না কেনো— শান্তি অর্জনের জন্য তার প্রচেষ্টাও থাকতে হবে নিরলস। আবার প্রচেষ্টাও চালাতে হবে নির্ভুল প্রক্রিয়ায়। আর মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত প্রক্রিয়া পদ্ধতি যেহেতু নির্ভুল নয়— তাই তাকে মুখ ফিরাতে হবে তার প্রতিপালকের দিকে— যিনি ভুলত্রুটি থেকে পবিত্র। মানুষের প্রতি যাঁর মেহেরবানির কোনো সীমা পরিসীমা নেই।

আল্লাহ্পাকই মানবতার রূপরেখা প্রণয়নের একমাত্র অধিকারী। যুগে যুগে মুক্ত মানবতার বাণী যাঁরা বহন করে এনেছেন পথভ্রান্ত মানুষের জন্য, তাঁরা আল্লাহ্পাক কর্তৃক নির্বাচিত বান্দা- নবী, রসুল। এই মুক্ত মানবতার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হচ্ছেন শেষ নবী মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। এখন তাঁর আনুগত্যের আওতাভুক্ত না হয়ে মুক্ত মানবতার স্বপ্ন দেখা চরম নির্বুদ্ধিতা বই আর কিছুই নয়। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তাঁর সফল অনুসরণের মধ্যেই সজ্জিত করতে সক্ষম হন তাঁদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনকে।

মহানবী স. এর শরীয়তই সমস্ত প্রকার সৌভাগ্য অর্জনের চাবিকাঠি। শরীয়তের বন্ধনের মাধ্যমেই উন্মোচিত হয় মানবতার সীমাহীন আকাশ। শান্তির কপোত এই আকাশেই নিশ্চিন্তে ডানা মেলে দিতে পারে। যারা শরীয়তের বন্ধনকে মানবমুক্তির প্রতিকূল বলে মনে করে, তারা তো প্রবৃত্তির (নফসের) বন্ধনে আবদ্ধ। তারা আপাতদৃষ্টিতে তিক্ত প্রতিষেধকের মতো শরীয়তকে অপছন্দ করে। তাই তাদের ব্যাধি দিন দিন হয়ে ওঠে দূরারোগ্য।

মানুষকে এই প্রবৃত্তির কারাগার থেকে মুক্ত করবার জন্য যাঁরা উৎসর্গ করেন তাঁদের সমগ্র জীবন তাঁরাই পীর বা মোর্শেদ নামে খ্যাত। তাঁরা আখেরী নবী স. এর প্রকৃত প্রতিনিধি। তাঁদের অনুগমন ব্যতীত প্রবৃত্তি আক্রান্ত মানুষের জন্য বিকল্প কোনো পথ খোলা নেই এখন।

শরীয়তের সজ্জায় পূর্ণরূপে সজ্জিত হতে গেলে প্রত্যেককে তিনটি জিনিস অর্জন করতে হবে। প্রথমতঃ জ্ঞান অর্জন করতে হবে আল্লাহ্পাকের আদেশ এবং নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে। দ্বিতীয়তঃ জ্ঞাত বিষয় অনুযায়ী কাজ (আমল) করতে হবে। তৃতীয়তঃ অর্জন করতে হবে বিশুদ্ধ নিয়ত (এখলাস)। এই নিয়তের উৎপত্তিস্থল মানুষের অন্তর (কলব)। এই কলব বিশুদ্ধ করবার জ্ঞান অর্জনের জন্যই পীর বা মোর্শেদের শরণাপন্ন হতে হয়।

এই নিয়মেই শরীয়তের পূর্ণ পাবন্দ হয়েছেন পূর্ববর্তী জামানার ওলামা, মাশায়েখগণ। এর ব্যতিক্রম হলে নিয়তের বিশুদ্ধতা অর্জিত হবে না। তার ফলে রূহানিয়াত বিবর্জিত শরীয়তের বাহ্যিক আকৃতি নিয়েই পড়ে থাকতে হবে সারা জীবন।

ইসলামের এই প্রাণপ্রবাহ (রূহানিয়াত) জারী রাখবার প্রচেষ্টায় যাঁরা প্রাণপাত করেছেন তাঁদের কাফেলার একজন সফল সিপাহসালার ছিলেন হজরত হাকিম আবদুল হাকিম রহ.। অতি সম্প্রতি পরপারে পাড়ি দিয়েছেন তিনি। তাঁর জীবন বৃত্তান্ত ধরে রাখা হলো 'তুমিতো মোর্শেদ মহান' গ্রন্থে।

এবারও আমাদের আহ্বান রইলো সবার প্রতি। উন্মুক্ত দুয়ার। প্রবেশ করুন এ কাফেলার অভ্যন্তরে। আসুন, শরীয়ত প্রতিষ্ঠার মহান উদ্যোগে সম্মিলিতভাবে শরীক হই সবাই।

প্রারম্ভে এবং অবশেষে সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

থামো মওদুদীরা। রুখ যাও। স্বীকার করো অনুতাপের অধীনতা। তওবা করো। তোমরাও কি দুর্ভাগা মওদুদীর মতো তওবা ব্যতিরেকেই পৃথিবীর জীবন শেষ করবে? একদল চট্টগ্রামে গমনেচ্ছু যাত্রী যদি ভুল করে খুলনার গাড়িতে ওঠে তবে সে খুলনাতেই পৌঁছবে। চট্টগ্রাম নয়। যদিও তার চট্টগ্রাম গমনের নিষ্কলুষ নিয়ত অন্তরে বিদ্যমান থাকে। যারা খাঁটি নিয়তে ইসলাম চাও অথচ ভুলে মওদুদী সংগঠনে ঢুকে পড়েছো— তাদের জন্যই তওবার আহবান। যাহারা প্রকৃত মুনাফিক— তওবার নেয়ামত তাদের নছিব হবার নয়। ইবলিস আল্লাহ্তায়ালাকে অস্বীকার করেনি। অপরাধ তার এই— সে আল্লাহ্তায়ালার প্রিয় নবী হজরত আদম (আঃ)কে যাচাই বাছাই করেছে। আবুল আলা মওদুদীও তেমনি। আল্লাহ্কে স্বীকার করেও সে যাচাই করেছে আল্লাহ্তায়ালার প্রিয় নবী, রসূল, সাহাবা এবং আউলিয়া সম্প্রদায়কে। ইবলিস যেমন হজরত আদম (আঃ)কে যাচাই বাছাই করে ত্রুটি খুঁজে পেয়েছে— তেমনি নবী, রসূল, সাহাবা, আউলিয়াগণকে যাচাই বাছাই করে মওদুদীও ত্রুটি খুঁজে পেয়েছে বিস্তর। শয়তান আদম (আঃ)কে সেজদা করে সম্মান জানায়নি— মওদুদীও আল্লাহ্পাকের অনুগৃহীত ব্যক্তিদের পথে সমর্পিত হয়নি। অথচ প্রতি নামাজের প্রতি রাকাতে আমাদেরকে পাঠ করতে হয়— "ইয়া আল্লাহ্ আমাদেরকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করো— তাদের পথ যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ বর্ষণ করেছো...।"

আল্লাহ্পাকের অনুগৃহীত ব্যক্তিগণকে যাচাই বাছাই করার অপরাধের শাস্তি লানত (অভিশাপ)। তাই ইবলিস যেমন অভিশপ্ত। মওদুদীও তাই। মওদুদীর অনুসারীরাও তাই।

হাদিস শরীফের বর্ণনানুযায়ী সাহাবায়ে কেরামগণের (রাঃ) দোষ চর্চাকারীরা অভিশপ্ত। তাঁদের প্রতি বিশ্বাসী বান্দাদের করণীয় আমল চারটি। ১. তাদের ইমাম বানিয়ে নামাজ পড়া যাবে না। ২. তাদের মেয়েদেরকে বিবাহ করা যাবে না। ৩. তাদের ছেলেদের সঙ্গে আমাদের মেয়েদেরকে বিবাহ দেওয়া যাবে না। ৪. তাদের জন্য দোয়া করা যাবে না (সালাম আদান প্রদান, জানাজা পড়া এসমস্ত দোয়ার অন্তর্ভুক্ত বিষয়)।

একদল চোর, ডাকাত কিংবা খুনীর চেয়েও মওদুদীরা বড় অপরাধী। কারণ সকল প্রকার খুনী ডাকাতদের দ্বারা আমাদের পার্থিব ক্ষতি হয়। কিন্তু মওদুদীদের দ্বারা ক্ষতি হয় আখেরাতের। নিষ্কলুষ আকিদা বিশ্বাসের। একজন নাস্তিক আহমদ শরীফের চেয়েও একজন গোলাম আজম ইসলামের জন্য অধিক ক্ষতিকর। কারণ, নাস্তিককে ইমানদার মানুষেরা এড়িয়ে চলতে পারে কিন্তু মওদুদীদেরকে সরলপ্রাণ মুসলমানরা

এড়িয়ে চলবে কিভাবে? তারা যে আমাদের মসজিদ, মাদ্রাসায়, সমাজে ঘাপটি মেরে বসে আছে। আর সরলপ্রাণ মানুষদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে মওদুদী মতবাদের দিকে। আবার দেখুন, একদল কাদিয়ানি কিংবা শিয়ার চেয়েও তারা বেশী ভয়ংকর। কারণ শিয়া ও কাদিয়ানিরা চিহ্নিত। তাদের মসজিদ, সমাজ আলাদা। কিন্তু মওদুদীরা এখনও অচিহ্নিত। মদীনা মনোয়ারার মুনাফিকরা যেমন সাহাবগণের দলে মিশে থাকতো আর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতো— যেমন ইসলামের ঘোর দুশমন খারেজীরা ইসলামের জন্য মায়াকান্না কাঁদতো আর শলাপরামর্শ করতো কীভাবে মুসলমানদের ক্ষতি করা যায়— মওদুদীরাও তেমনি আমাদের সমাজে, মসজিদে, মাদ্রাসায় ইসলামের দরদী সেজে ঢুকে পরে কখনো বাবরী মসজিদ ধ্বংসকারী নেতাদের সঙ্গে পরমর্শ করে আসছে, কখনো প্রতিষ্ঠা করছে নারী শাসনের মতো বিকৃত ঐতিহ্য। স্মরণ রাখতে হবে একাত্তর সালে ঘাতক দালালের ভূমিকাও তারা নিয়েছিলো ইসলামের নামেই।

অতএব, মওদুদীরা সাবধান হও। তওবা করো। ফিরে এসো তার প্রতিষ্ঠিত শয়তানী সংগঠনটি থেকে। ইসলমের জড়বাদী ব্যাখ্যা তোমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে। তোমাদের মস্তিষ্ক হয়েছে উত্তপ্ত। অন্তরের খবর কি নিয়েছো কখনো? জড়বাদী শক্তি ইসলামের প্রধান শক্তি নয়। রূহানী শক্তিই প্রধান শক্তি। ভেবেছো কখনো যে, এই রূহানী শক্তির অভাবেই মুসলমানরা লাঞ্ছিত অপমানিত হচ্ছে সারা পৃথিবীতে?

রূহানী কাফেলার দিকে এসো। আউলিয়া কেরামের মাধ্যমেই আমরা পেয়েছি ইমান, হেদায়েত। এদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর অন্তরের আর্তির কাছে সমবেত হও। এই দরবেশের দেশে বহুধিকৃত মওদুদী অবাঞ্ছিত, অসুন্দর।

আলহামদুলিল্লাহ্। 'তুমিতো মোর্শেদ মহান' সপ্তমবারের মতো প্রকাশিত হচ্ছে। ক্ষণজন্মা আউলিয়া হজরত হাকিম আবদুল হাকিম (রহঃ) এর জীবন আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দ্বীন ইসলামের মূল বিষয়গুলোরও আলোচনা সন্নিবেশ করেছি এতে। আশা করি আমরা বঙ্গবাসীরা এ সমস্ত বিবরণ জেনে উপকৃত হবে। আল্লাহ্পাক তৌফিক দান করুন।

স্তুতিসমূহের অধিকারী সেই চিরন্তন জাত বারীতায়ালাই। সর্বোৎকৃষ্ট দরূদ ও সালাম মহানবী মোহাম্মদ (সঃ), তাঁর অন্যান্য নবী ভ্রাতৃবৃন্দ, তাঁর সম্মানিত সাহাবা সমাজ, তাঁর পবিত্র পরিবার পরিজন এবং আউলিয়া কেরামের প্রতি। আল্লাহুম্মা আমিন।

ওয়াস্সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

আমাদের বই

- তাফসীরে মাযহারী (১–১২) মোট ১২ খণ্ড।
- মাদারেজুন্ নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
- মুকাশিফাতে আয়নিয়া
- মাআরিফে লাদুন্নিয়া
- মাব্দা ওয়া মা'আদ
- মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
- নকশায়ে নকশ্বন্দ
- বায়ানুল বাকী
- জীলান সূর্যের হাতছানি
- চেরাগে চিশ্তী
- কালিয়ারের কুতুব
- প্রথম পরিবার
- মহাপ্রেমিক মুসা
- নূরে সেরহিন্দ
- নবীনন্দিনী
- পিতা ইব্রাহীম
- আবার আসবেন তিনি
- সুন্দর ইতিবৃত্ত
- ফোরাতের তীর
- মহাপ্লাবনের কাহিনী
- দুজন বাদশাহ্ যাঁরা নবী ছিলেন
- কী হয়েছিলো অবাধ্যদের
- THE PATH
- পথ পরিচিতি
- নামাজের নিয়ম
- রমজান মাস
- ইসলামী বিশ্বাস
- BASICS IN ISLAM
- মালাবুদ্দা মিনহু
- সোনার শিকল
- বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন
- সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও
- তৃষিত তিথির অতিথি
- ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
- নীড়ে তার নীল ঢেউ
- ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা

সেই গ্রাম এখনও গ্রামই আছে। প্রায় আশি বছর আগে যেমন ছিলো। প্রায় শতাব্দী কালের মধ্যে এ উপমহাদেশে কতো কিছু পরিবর্তন হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়েছে ভারতবর্ষ। দেশ ভাগ হয়েছে দুই দুইবার। কত গ্রাম হয়েছে শহর— হয়েছে ব্যস্ত জনপদ। কিন্তু কালুতলা গ্রাম এখনও গ্রামই আছে।

অনন্য বাংলার অন্য সব গ্রামের মতো এখানেও বিরাজ করে ছায়াঢাকা নীরবতা। পাখি ডাকে নিঝুম রাত্রিতে, ভোরে। এখানে ওখানে নারকেল গাছ, আম, কাঁঠাল, বেল। মেঠো রাস্তার দুপাশে পুকুরের পাড়ে ঝোপঝাড়, অল্প বিস্তর জঙ্গল।

পুষ্করিণী কয়েকটাই আছে। কোনোটাতে আছে ইট বাঁধানো ঘাটলা। কোনোটায় নেই। সর্দার বাড়ীর নিকটে মসজিদ। উঁচু ভিতের উপরে প্রতিষ্ঠিত মসজিদের বয়স একশ' বছরের কম হবে না। দেখলেই স্মৃতি সজাগ হয়।

এখানে এই ছোট মসজিদে একশ' বছর ধরে কতোবার আজান হয়েছে। কতোবার নামাজ হয়েছে। এখনও হয়। তবে সেই জৌলুষ, সেই শান শওকত এখন আর নেই— প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে যেরূপ ছিলো।

তখন দিল্লীর শাহজানপুর থেকে এখানে তশরীফ নিয়ে আসতেন হজরত মাওলানা হাজী রিয়াসত আলী খান র.। এই মসজিদেই তখন বসতো জিকিরের মজলিশ। প্রেমের মহফিল। কতোবার তিনি ছুটে এসেছেন এখানে। বাংলার এই ছায়াঢাকা গ্রামের আকর্ষণে— তাঁর প্রিয় মুরিদ হজরত আমিনউদ্দিন র. এর টানে। তরিকা প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে এখানে তাঁকে অনেকবারই আসতে হয়েছে। অকাতরে বিলিয়ে দিতে হয়েছে আশেকজনের দিল থেকে দিলে আল্লাহ্ প্রেমের জান্নাতি সুরভি।

মাশুকের দরবারে মোর্শেদের প্রত্যাবর্তনের পরেও এখানে এই কালুতলা গ্রামের ছোট্ট মসজিদে দীর্ঘদিন ধরে দরবার রওশন করে রেখেছিলেন হজরত আমিনউদ্দিন র.। প্রায় চল্লিশ বছর হলো তিনিও প্রভুর সান্নিধ্যে উপনীত হয়েছেন। তখন থেকেই মহফিল আর বসে না। মসজিদে এখনও আজান হয়। কিন্তু আজানের সেই প্রাণ আর নেই।

সর্দার বাড়ীর এক মাটির ঘরে, শান্ত ছায়াচ্ছন্ন গ্রামে প্রায় আশি বছর আগে জন্ম নিলেন তিনি। গৃহকর্তা হজরত আমিনউদ্দিন দেখলেন তাঁর একমাত্র পুত্রসন্তানের জোৎস্নার আলোর মতো পবিত্র মুখ। পুষ্পের পাপড়ির মতো হাত পা শরীর। আনন্দে অধীর হলেন তিনি। আল্লাহ্পাকের দরবারে জানালেন লাখো শুকরিয়া।

আল্লাহ্‌পাকের কতো দয়া। কতো মেহেরবানি। মহা হেকমতময় আল্লাহ্‌, দিনরাত্রির পরিবর্তনের মধ্যে, আসমান জমিনের সৃষ্টি-রহস্যের মধ্যে কতোনা নিশানা রেখে দিয়েছেন। এই বিশাল জগতের প্রতিনিধি হিসেবে, খলিফা হিসেবে আওলাদে-আদম প্রেরণের মধ্যেও মহামহিম প্রভুর কতো হেকমত, কতো রহস্য লুকিয়ে আছে। কে অনুসন্ধান করে সে সব?

হজরত আমিনউদ্দিন নবজাত সন্তানের নাম রাখলেন আবদুল হাকিম। বুজুর্গ পিতা, নেককার মাতা অপলক নেত্রে চেয়ে দেখেন নিষ্পাপ শিশুর দিকে। মন বলে, এই শিশু ভবিষ্যতে অনেক বড় অলিআল্লাহ্‌ হবে। তার রূপে গুণে মোহিত হবে অসংখ্য আশেকের দল।

হজরত আমিনউদ্দিন র. এর এক মেয়ে এবং এক ছেলে। ছেলের নাম আবদুল হাকিম। আর কোনো সন্তান সন্ততি নেই তাঁর। পিতা মাতা এবং বড়বোনের স্নেহচ্ছায়ায় ছায়াঢাকা কালুতলা গ্রামে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠেন আবদুল হাকিম—পরবর্তী সময়ের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এক বিস্ময়কর বুজুর্গ হজরত হাকিম আবদুল হাকিম র.।

ষড়ঋতুর দেশ বাংলা। বিচিত্র, সুন্দর। পৃথিবীর সব দেশের মতো এখানেও সময় বয়। মওসুম বদল হয়। শরতের স্বচ্ছ আসমান, হেমন্তের ধান কাটাকাটি, বরষার বারিধারায় একের পর এক মওসুম ঘুরে ঘুরে আসে। গ্রীষ্মের তেজি রোদ, শীতের শীর্ণ নদী, বসন্তের বাউল বাতাস একে একে আসে। যায়। আবার আসে। আবার যায়।

কালুতলা গ্রামে ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠেন হাকিম আবদুল হাকিম। সমবয়সী সব ছেলেদের সঙ্গে চলাফেরা করলেও অন্যদের মতো তিনি নন। স্বভাবে চলনে বলনে তিনি অন্যরকম। শিশুসুলভ কোনো ভয় নেই তাঁর। দূরন্ত স্বভাব। চোখের গভীরে কৌতূহল। যা দেখেন তার ভিতর বাহির সব কিছু দেখে নিতে চান। যা শোনেন তার সব কিছুই বুঝে নিতে চান।

সঙ্গী সাথীদের মধ্যে কেউ দোষ করলে সঙ্গে সঙ্গেই নেমে আসে তার উপরে আবদুল হাকিমের কিল ঘুষি। তাঁর পছন্দ সোজাসুজি সবকিছু বলা। কারো প্যাঁচ-গোচ দেখলে, দুরভিসন্ধি দেখলে ক্ষেপে যান। যা বলার সোজাসুজি বলতে হবে। যা করা দরকার সোজাসুজি করতে হবে।

এখান ওখান থেকে মাঝে মঝে হজরত আমিনউদ্দিন র. এর কাছে নালিশ আসে। দূরন্ত সন্তানকে তিনি কড়া শাসন করতে চান। কিন্তু পারেন না। কারণ, তাঁর স্বভাবের

মধ্যেই কড়াকড়ি কিছু নেই। মাটির মতো, একেবারে খাঁটি মাটির মতো স্বভাব তাঁর। ছেলেকে শাসন করবেন কিভাবে। তাছাড়া ওতো অন্যায় কিছু করে না। কেউ অন্যায় করলে সহ্য করতে পারে না এই যা। দূরন্তপনা করলে কি হবে, খোকার মনটা একেবারে ফুলের মতো কোমল, পবিত্র, প্রেমময়। কিন্তু মানুষতো তা বোঝে না। শুধু তার দূরন্তপনাটাই দেখে।

আবদুল হাকিমের দূরন্তপনা কমে না। অদ্ভুত অদ্ভুত খেয়াল হয় তাঁর। মাথায় যা ঢুকবে তাই শেষ পর্যন্ত করতে হবে। এদিকে বয়স বেড়ে যাচ্ছে। অথচ পড়াশুনায় মনোযোগ নেই। বিদ্যালয়ে নিয়মিত হাজিরাই দিতে চায় না। বইয়ের পৃষ্ঠায় জ্ঞানার্জনে কৌতুহল নেই তাঁর। বিশাল এই দুনিয়াটা, ঐ বিরাটকায় আসমান, গাছগাছালী, জীবজন্তু, বিচিত্র ধরনের মানুষ— এসব পড়াই যেন তাঁর পছন্দ খুব। যা মানুষ সাধারণত করেনা— যা ব্যতিক্রম কিছু, নতুন কিছু, উদ্ভট কিছু, সে সবের প্রতিই তাঁর দুর্বার আকর্ষণ।

একদিন আবদুল হাকিম কোত্থেকে এক শকুন ধরে এনে হাজির। শকুনটাকে পুষতে হবে। কাণ্ড দেখেতো সবাই তাজ্জব! করে কি খোকা, শকুন কি পোষ মানে? কিন্তু কে শোনে কার কথা। শকুনটা পুষতেই হবে। এরকম সব উদ্ভট চিন্তা যা মাথায় ঢুকবে, তা তাঁর করা চাই।

পড়াশুনার প্রতি ক্রমে ক্রমে টান কমতে থাকে আবদুল হাকিমের। কোনো রকমে কয়েক ক্লাশ পড়বার পর একেবারে বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় তাঁর।

তাই হয়। আল্লাহ্পাক যা ইচ্ছা করেন। আমাদের নবীজীকে স., অন্যান্য সমস্ত নবীদেরকে আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টি রহস্যের প্রতি, এই বিরাট জগতের পুস্তকের প্রতি, আকাশ পৃথিবীতে পাহাড়ে পর্বতে ছড়ানো-ছিটানো হাজারো নিশানার প্রতি দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করবার পাঠ দিয়েছিলেন। নিজের তরফ থেকে এলেম দান করেছিলেন। এ সবই আল্লাহ্পাকের ফজল। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই এই নেয়ামত প্রদান করেন।

শহীদে বালাকোট সৈয়দ আহমদ বেরলভী র.ও ছিলেন এরকম। আল্লাহ্পাক তাঁকে নিজের তরফ থেকে এলেম দান করতে চেয়েছিলেন বলেই বাল্যকাল থেকেই কেতাবের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিলো না। অথচ মাওলানা ইসমাইল শহীদ র. মাওলানা আবদুল হাই (রঃ), মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) এবং আরো হাজারো আলেম তাঁর অনুগমন করে সমৃদ্ধ হয়েছিলেন, সঠিক পথের দিশা খুঁজে পেয়েছিলেন। এযে আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তাকেই এই নেয়ামত প্রদান করেন।

বিদ্যাশিক্ষার পাঠ চুকলো। কৈশোরে পদার্পণ করলেন তিনি। দূরন্তপনা পূর্বের তুলনায় কমেছে বটে। কিন্তু কৌতূহল বেড়েছে অনেক বেশী। সাহস বেড়েছে আরো বেশী। এখন তিনি সবসময় সঙ্গে রাখেন একটা তলোয়ার— প্রায় দেড় হাত লম্বা।

শৈশবের স্বপ্নিল হাবভাব এখনো তাঁর চোখ মুখে। ব্যতিক্রম একটা কিছু দেখলেই মনে হয়— এটা বুঝতে হবে, হাসেল করতে হবে। দেখতেই হবে এর শেষ কোথায়।

একবার গ্রামে রীতিমতো হৈ চৈ পড়ে গেলো। পাশের নদীর ধারে এক সাধু এসে বাসা বেঁধেছে। বিরাট সাধক নাকি সে। বহু বছর সাধন-ভজন করে সে নাকি বহুকিছু অলৌকিক শক্তি অর্জন করেছে। সাধনাবলে সে নাকি নদীর পানির উপরে বসে থাকতে পারে। ডোবে না। অনেক লোক দেখেছে। সাধুর অলৌকিক কাণ্ড দেখে ভক্তিতে সবাই গদগদ— বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়। সিদ্ধ পুরুষ বটে।

আব্দুল হাকিম সংবাদ শুনেই ছুটলেন নদীর ঘাটে। দেখলেন ঘটনা সত্যিই। সাধু পানিতে বসে থাকতে পারে। ডোবে না। তাজ্জব ব্যাপার তো। শিখতেই হবে এই বিদ্যা, কি করে পানিতে ভেসে থাকা যায়। সাধু বাবাই শুধু পারবে এ কাজ, আর কেউ পারবে না কেনো?

আবদুল হাকিম সাধুবাবার কাছে বায়না ধরলেন, যেভাবে হোক এ বিদ্যা তাঁকে শেখাতেই হবে। সাধু নিরুৎসাহিত করলো তাঁকে, 'এ শিখতে গেলে অনেক সাহস দরকার। ওসব তুমি পারবে না।'

আবদুল হাকিম নাছোড়বান্দা। না পারার কি আছে। শেখালেইতো সবকিছু শেখা যায়। ভয় ভীতির কি আছে।

আবদুল হাকিমের পীড়াপীড়িতে শেষে রাজী হয়ে গেলো সাধু। বললো 'অমাবস্যার রাতে আসতে হবে শশ্মান ঘাটে। ভয় পেলে চলবে না। ভয়ংকর সাহসের প্রয়োজন।'

সাধুর কথামতো অমাবস্যার রাতে আবদুল হাকিম গিয়ে হাজির হলেন শশ্মানঘাটে। এবার সাধনা শুরু করতে হবে। একটা মরালাশ যোগাড় করে সাধু সে লাশের উপরে চড়ে বসলো। ছোট একটা প্রদীপ জ্বালালো। পাশে রাখলো পানিতে ভিজানো কি কি যেনো। পানিও গঙ্গাজল জাতীয় কিছু হবে হয়তো।

চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। তার মধ্যে টিমটিমে আলোয় নির্জন প্রান্তরে মড়ার কাছে বসে সাধু আর আবদুল হাকিম। আবদুল হাকিমের মনে কোনো ভয় নেই। মনোযোগ শুধু সাধুর দিকে। সাধু মন্ত্র উচ্চারণ করে— আবদুল হাকিমও পড়েন সে সব— আর কি সব বলে বলে মড়ার উপরে পানি ছিটিয়ে দিতে হয়। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত এসব তন্ত্র-মন্ত্র পড়বার পরও যখন সাধু দেখলো এই কিশোর একেবারে নির্বিকার, তখন মন্ত্র-তন্ত্র শেষ করে খুশীতে সাধু বলে উঠলো, 'এবার তোমার সিদ্ধিলাভ হয়েছে।'

আবদুল হাকিম খুশীতে বাগ-বাগ। সঙ্গে সঙ্গে সাধুকে নিয়ে পাশের নদীতে গেলেন তিনি। এখনই দেখতে হবে পানিতে ভেসে থাকা যায় কিভাবে।

সাধুও খুশী। শিষ্যের সিদ্ধিলাভে কোন্ গুরুর না আনন্দ হয়। কিন্তু শেষে সবকিছু গোলমাল হয়ে গেলো। আবদুল হাকিম নদীর পানির উপরে বসতে চাইলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। সারা রাতের সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেলো। যতোবারই তিনি চেষ্টা করলেন কোনোবারই পানিতে বসে থাকতে পারলেন না।

কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর রাগে তাঁর শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠলো। তলোয়ারের ডগাটা সাধুর বুকে ঠেকিয়ে দিয়ে বললেন, 'শয়তান। শয়তানি করার আর জায়গা পাস্‌নি, হয় গরুর গোশত খেয়ে মুসলমান হবি নয়তো এক্ষুণি এদেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবি। না হয় তোকে আমি মেরেই ফেলবো।'

বাবার তখন জান নিয়ে টানাটানি। অনেক কাকুতি মিনতি করে শেষ পর্যন্ত জানে বাঁচলো সাধুবাবা। পরদিন থেকে তার টিকিটিও আর দেখতে পায় না কেউ।

হজরত আমিনউদ্দিন (রহঃ)।

পুরো নাম আহমদ এছরার আলী ওরফে আমিন উদ্দিন। আজব মানুষ তিনি। সমস্ত অবয়ব সরলতার সৌন্দর্য আর মাটির মমতায় সমুজ্জ্বল। মাটির তৈরী খাঁটি মানুষ।

কাছের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। সামান্য মাইনে। ভিটে বাড়িটুকু আছে। তার সঙ্গে কিছু জমিজমা। সব মিলিয়ে কোনো রকমে চলে তাঁর সংসার। ফকিরের সংসার। অভাব আছে। কিন্তু তিনি নির্বিকার। ইবাদত বন্দেগীতেই কাটে তাঁর বেশীর ভাগ সময়।

সেই বাল্যবয়সেই তিনি সবক নিয়েছিলেন কাদেরিয়া তরিকার এক বুজর্গের নিকট। তারপর থেকেই বছরের পর বছর ধরে জারী রেখেছেন নিরবচ্ছিন্ন কঠোর সাধনা। সমস্ত রাত্রিই প্রায় তিনি করিকাঠের সঙ্গে পা বেঁধে জিকিরে রত থাকেন। কঠিন সাধনার মধ্যে দিয়েই সময় বয়ে যায়, সংসারে স্বচ্ছলতার জন্য চিন্তা করার মতো ফুরসত কোথায়। অল্পে তুষ্টির মধ্যেই তো ফকিরির সৌন্দর্য ও প্রশান্তি।

অথচ দুই পুরুষ পূর্বেও অভাব কাকে বলে, অস্বচ্ছলতা কি জিনিস তা জানা ছিলো না তাঁর। বিশাল জমিদারীর মালিক ছিলেন তাঁর পূর্ব পুরুষগণ। প্রভাব প্রতিপত্তি ছিলো। অর্থবল লোকবল ছিলো। দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিলো।

হজরত আমিনউদ্দিনের পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন পাঠান। খাস পাঠান মুলুক থেকে এক পাঠান সরদার এসে ঘটনাক্রমে এইখানে এই কালুতলায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁরই বংশধরগণ পরবর্তী সময়ে যোগ্যতা বলে লাভ করেন জমিদারী। তখন সমস্ত ভারতবর্ষ ছিলো মোঘল শাসনাধীন। বৃটিশ রাজত্বের শেষ দিকে এসে বাধলো বিপত্তি। পাশের হিন্দু জমিদারেরা এক রক্ষিতা রমণীকে বাসভবন তৈরী করে দিলো হজরতের পূর্ব পুরুষগণের জমিদারীর আওতাধীন এক স্থানে। এই নিয়ে বাঁধলো গোলযোগ। সংঘর্ষ। শেষ পর্যন্ত থানা পুলিশ।

থানা পুলিশের পক্ষপাতিত্বের কারণে প্রচণ্ড রোষে ফেটে পড়লেন তৎকালীন জমিদার, হজরতের দাদা। দারোগা পুলিশ সবাইকে লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে তিনি ছুঁড়লেন বন্দুকের গুলি।

ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ালো গুরুতর। দারোগা পুলিশ হত্যার ফলস্বরূপ জমিদারী গেলো। অর্থ গেলো। বিত্ত প্রভাব প্রতিপত্তি সব গেলো। বংশধরগণ উত্তরাধিকার সূত্রে পেলেন শুধু ভিটেবাড়িটুকু। আর সামান্য কিছু ফসলের জমি। সেই থেকে অভাবের সংসার। কিন্তু হজরত আমিনউদ্দিনের সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। ইবাদত-বন্দেগী জিকির-আজকারে কাটে তাঁর দিনের অবসর সময় আর রাতের প্রায় সর্বক্ষণ।

মাঝে মাঝে একমাত্র ছেলে আবদুল হাকিমের জন্য পেরেশান হতে হয়। উদ্ভট-আজগুবি তার কাজ কারবার। দুনিয়ার সবাই একরকম, আর সে একাই অন্যরকম। দিন দিন তার ঘরের আকর্ষণ কমে যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই কোথায় যেনো উধাও হয়ে যায়। আবার ফিরে আসে। আবার যায়।

এক মজ্জুব ফকির হজরত আমিনউদ্দিনের খুবই ভক্ত ছিলেন। নাম মমতাজ আলী শাহ্। সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে থাকেন। নির্জন স্থানে মনের সুখে ইবাদত-বন্দেগী, জিকির আজকার করেন। অনেক দিন পর হঠাৎ কখনো কখনো তিনি এসে হাজির হন হজরত আমিনউদ্দিনের দরবারে। হজরত তাঁর যত্ন-আত্তি করেন। কিন্তু তবু দু'চার দিন যেতে না যেতেই শাহ্ সাহেব অস্থির হয়ে পড়েন পুনরায় জঙ্গলে যাবার জন্য। হজরতের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে নিজের আস্তানায় ফিরে যান আবার। জঙ্গলের হিংস্র নিরীহ সব ধরনের পশুপাখি নিয়ে তার বনজ সংসার।

শাহ্ সাহেব আবদুল হাকিমকেও স্নেহ করেন খুব। একবার তিনি এসে বললেন, 'খোকাকে এবার নিয়ে যাবো। কিছুদিন আমার কাছে থাকবে সে।'

শাহ্ সাহেবের প্রস্তাবে হজরত রাজী হলেন শেষ পর্যন্ত। মজ্জুব মানুষ— নিজেই যখন বলেছেন, তখন চিন্তার কোনো কারণ নেই। আবদুল হাকিম তো আনন্দে আত্মহারা। এবার নতুন জায়গা দেখা হবে। সুন্দরবন দেখা হবে।

বনে এসে আবদুল হাকিম তাজ্জব হয়ে যান। কি বিশাল জঙ্গল। নীরব নিথর। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে লোনা নদী। বেশীদূর দৃষ্টি যায় না। চারিদিকে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। দুর্ভেদ্য গভীর জঙ্গল।

শাহ্ সাহেব নদীর ধারে এক জায়গায় বসতে বললেন আবদুল হাকিমকে। অনেক কারামত আছে শাহ্ সাহেবের। খোকা যখন যা খেতে চান, তাই হাজির করেন তিনি। নিজের খাওয়া দাওয়ার দিকে খেয়াল রাখেন না মোটেও। দিনের পর দিন রোজা রাখেন। সেহেরীর সময় 'বিসমিল্লাহ্' বলে হাতের তালুতে পানি নিয়ে এক চুমুক পানি পান করেন। আবার ইফতারের সময় ইফতারও করেন ঐ এক চুমুক পানি দিয়েই। আর গাছের ডালের সঙ্গে দড়ি দিয়ে দুই পা বেঁধে নিজেকে উল্টো করে ঝুলিয়ে দিয়ে শুরু করেন বিরামহীন জিকির। কি কঠোর সাধনা।

হঠাৎ একদিন শাহ্ সাহেব বললেন, 'আমাকে জঙ্গলের ভিতরে যেতে হবে। ফিরতে দুই একদিন দেরী হবে হয়তো। তুমি এখানেই থাকো খোকা। কোনো ভয় নেই। খাবার যা যা প্রয়োজন তাই পাবে। তোমার পাহারার ব্যবস্থাও করে যাচ্ছি।

'এ্যাই' বলতেই এক বিরাট বাঘ এসে হাজির হলো। একবারে রয়েল বেঙ্গল টাইগার। শাহ্ সাহেব বললেন, খোকাকে পাহারা দিবি আমি আসা পর্যন্ত।'

শাহ্ সাহেব গভীর জঙ্গলে চলে গেলেন। গেলেন তো গেলেনই। ফিরবার নাম নেই। এদিকে আবদুল হাকিম একা। নিজের হাতে রান্না বান্না করেন, খান। আর রয়েল বেঙ্গল টাইগার পাহারা দেয় তাঁকে। ভাবেন তিনি— বনের বাঘও কথা শোনে মানুষের। মানুষ তাহলে কি? সাধনা করলে মানুষ আরো কতো কিছুইনা করতে পারে।

হজরত হাজী রিয়াসত আলী খান শাহজানপুরী (রহঃ)। দিল্লী থেকে প্রায় দু'শ মাইল দূরে শাহজানপুর। জেলা শহর। সেই শাহজানপুরেরই অধিবাসী তিনি।

বাল্যকাল থেকেই এলেম তলবের নেশা তাঁকে পেয়ে বসে। বিভিন্ন মাদ্রাসায়, বিভিন্ন আলেমের নিকট থেকে তিনি এলেম শিক্ষা করে এলেমে বুৎপত্তি অর্জন করেন। অর্জন করেন মুফতি হবার যোগ্যতা। হকপন্থী আলেম হিসেবে, ধর্মীয় বিভিন্ন জটিল বিষয়ে ফতোয়া প্রদানের যোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে ধীরে ধীরে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে এখানে ওখানে, সর্বত্র। সচ্ছল পরিবারের সন্তান তিনি। তার উপর ধর্মীয় ব্যাপারে বিশেষ অবদানের কারণে প্রচুর খ্যাতিও লাভ করেন অল্প দিনের মধ্যে। লাভ করেন যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও সম্মান।

কিন্তু এতো কিছু সত্ত্বেও অন্তরে শান্তি নেই তাঁর। আল্লাহ্পাকের ইশক্ তলবের সহজাত ইচ্ছেটা বার বার মনের মধ্যে গুমরে গুমরে ওঠে। কিন্তু কিভাবে এর একটা সুরাহা করা যায়? প্রেমের পথ, এলমে মারেফতের পথ তো সহজ পথ নয়। অনেক মোজাহেদা প্রয়োজন— দীর্ঘদিন ধরে একগ্রচিত্তে সাধনার প্রয়োজন। সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন পথ প্রদর্শকের। কামেলে মোকাম্মেল মোর্শেদের। কামেলে মোকাম্মেল মোর্শেদ ছাড়া কিছুতেই এ পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

রিয়াসত আলী খান মোর্শেদের তালাশে অস্থির হয়ে ওঠেন। পিয়াসী অন্তরকে যিনি আল্লাহ্ প্রেমের শারাবন তহুরার পবিত্র নেশায় উন্মত্ত করে তুলতে পারেন, কোথায় সেই মোর্শেদের ঠিকানা। কোথায় সেই সুন্দর সাকী যার হাতে রয়েছে আল্লাহ্র ইশকের নূরানী পেয়ালা।

উত্তর প্রদেশের রামপুরে তখন বাস করতেন মোজাদ্দেদিয়া সিলসিলার একজন বিখ্যাত বুজুর্গ। নাম হজরত এরশাদ হোসেন আহমদী (রহঃ)। নূরে ভরপুর ছিলো তাঁর মোবারক দরবার। তাঁর প্রজ্জ্বলিত প্রেমের শামাদানের আলোকচ্ছটায় শত শত আশেকের দিল তখন আত্মহারা।

সন্ধান পেয়ে হজরত হাজী সাহেব সেই দরবারেই গিয়ে হাজির হলেন। একান্ত আজিজির সঙ্গে নিজের মনের বাসনা জানালেন হজরত মুফতী রিয়াসত আলী খান। বায়াত হবার দরখাস্ত পেশ করলেন। কিন্তু দরখাস্ত মঞ্জুর হলো না। হাজী সাহেবও নাছোড় বান্দা। হজরত বললেন, 'তুম মাওলা হো। আলেম লোগো কা দিলমে এলেম কা ফখর হোতা হায়। ফখর হোনেছে তো ইয়ে রাস্তে মে কাম নেহি বনেগা।'

হাজী সাহেব তবুও নিবৃত্ত হন না। শেষ পর্যন্ত হজরত তাঁকে বায়াত করেন। সিলসিলায়ে মোজাদ্দেদিয়ার অনন্ত নূরের প্রবাহ জারী করে দেন তাঁর দিকে। শোনা যায়, ফখর দূর করবার জন্য তিনি দুই বছর ধরে হাজী সাহেবকে খানকার দরবেশদের জন্য নির্ধারিত এস্তেঞ্জাখানায় ঢিলা কুলুখ জোগানোর দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন।

খাঁটি আশেক হাজী সাহেব ধীরে ধীরে তরিকতের মঞ্জিলসমূহ অতিক্রম করে চলেন। মোর্শেদের নির্দেশের চুল পরিমাণ খেলাপও করেন না তিনি। তাঁর খেদমত এবং এখলাসে মুগ্ধ হন হজরত এরশাদ হোসেন আহমদী (রহঃ)। তারপর এক মোবারক সময়ে তিনি হাজী সাহেবকে প্রদান করেন তরিকতে পূর্ণতা প্রাপ্তির সুসংবাদ।

অবশেষে কামালত অর্জন করার পর খেলাফত লাভ করেন তিনি এবং ফিরে আসেন শাহজানপুরে। প্রিয় জন্মভূমি শাহজানপুর এবার তাঁর হাস্তি মোবারকের নূরে নূরানী হয়ে উঠে। হাজী সাহেব এখন শুধু মাওলানা কিংবা মুফতিই নন। এখন তিনি পূর্ণ মারেফত অর্জনকারী একজন কামেলে-মোকাম্মেল মোর্শেদও। তালেবে-মাওলাগণের তিনি এখন পথ প্রদর্শক।

মোর্শেদের এরশাদ অনুযায়ী তিনি সুউচ্চ মহা মূল্যবান সিলসিলায়ে মোজাদ্দেদিয়ার প্রচার-প্রসারের কাজে আমৃত্যু নিয়োজিত রাখেন নিজেকে।

ক্রমে ক্রমে তালেবে মাওলাগণ এসে ভিড় করেন তাঁর ঐশীপ্রেমের উর্মিমুখর পবিত্র দরবারে। তালেবে এলেমগণও এসে জড় হতে থাকেন তাঁর সমৃদ্ধ দারুল উলুমে। হাদিস শরীফে উল্লিখিত জবানী (প্রকাশ্য) এলেম এবং কলবী (গোপন) এলেম— দুই ধরনের এলেম প্রচারের কাজে ক্রমে ক্রমেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন তিনি। সমসাময়িক প্রখ্যাত আলেম বুজুর্গগণের সঙ্গেও গড়ে ওঠে তাঁর গভীর সখ্যতা।

এলেম প্রচারের উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন ছাপাখানা। রচনা করতে থাকেন একের পর এক দ্বীনি কেতাব। নিজের ছাপাখানায় সে সমস্ত মুদ্রিত হয়। প্রচারিত হয় দেশে বিদেশে, সর্বত্র। ধীরে ধীরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের

মশহুর ওলামায়ে কেরামগণের মজলিশে প্রদীপ্ত চেরাগের মতো মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর শানদার ব্যক্তিত্ব। ছোট বড় বহু কেতাবসহ তাঁর বিখ্যাত ফেকার কেতাব 'জামেউল ফতোয়া' ইসলামের জ্ঞান ভাণ্ডারের এক মহামূল্যবান সম্পদ হয়ে আছে।

ইবাদত বন্দেগী, তালেবে এলেমগণের চাহিদা পূরণ, দ্বীনি কেতাব রচনা, তালেবে মাওলাগণের তরবিয়ত— এসব নিয়েই কেটে যাচ্ছিলো তাঁর ব্যস্ত সময়। হঠাৎ একসময় বাংলার প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয় তাঁর। কিসের আকর্ষণে যেনো বাংলার দিকে তিনি সফর শুরু করেন। চব্বিশ পরগণা জেলা এবং তৎপার্শ্ববর্তী এলাকাতেই তাঁকে মাঝে মাঝে সফর এখতেয়ার করতে হয়। এখানেও ধীরে ধীরে সাড়া পড়ে যায়। দলে দলে মানুষ এসে হাজির হতে থাকে হাজী সাহেবের পবিত্র সহবত লাভের আশায়। বায়াত গ্রহণ করে। সিলসিলায়ে খাস মোজাদ্দেদিয়ার জান্নাতি নূরের স্রোতে ভেসে যেতে থাকে।

আলীপুর গ্রামে তিনি স্থাপন করেন তাঁর প্রচার কেন্দ্র। মাওলানা বাশারত উল্লাহ্ এখানে ছিলেন তাঁর প্রধান শাগরিদ। পরে তিনি খেলাফত লাভ করেন।

আলীপুরে যখন আসতেন হাজী সাহেব সস্ত্রীকই আসতেন। কোনো কোনো বার কয়েক মাস ধরে অবস্থান করতেন। তালেবে মাওলাগণের তরবিয়ত করতেন। নতুন তালেবগণকে বায়াত করতেন। কাজ শেষ হলে ফিরে যেতেন শাহজানপুরে।

আশ্চর্য স্বভাবের মানুষ হাজী সাহেব। স্বভাবে চলায় বলায় কোনো আড়ম্বর নেই। পোশাকে জৌলুষ নেই। সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশী লম্বা ছিলেন তিনি। দীর্ঘ একহারা নূরাণী চেহারা। দেখলেই ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধায় প্রেমে মানুষের মন বিহবল হয়ে পড়ে। আহারেও কোনো আড়ম্বর নেই। মুরিদগণ বহুরকম উপাদেয় আহারের বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু ওসব তাঁর পছন্দ নয় মোটেও। নিজ হাতে বানানো রুটি এবং ডাল ছিলো তাঁর সবচেয়ে পছন্দনীয় খাবার।

সফরের সময় নিজের সামান বহন করবার এজাজত দেন না তিনি কোনো মুরিদকে। নিজের সামান নিজের লাঠির মাথায় বেঁধে ঘাড়ে নেন। বোধ করি প্রিয় মোর্শেদের প্রথম সাক্ষাতের কথা কোনোদিনই ভোলেননি তিনি, 'আলেম লোগোকা দিলমে এলেম কা ফখর হোতা হায়।'

হাজী সাহেবের নামডাক চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো ক্রমে ক্রমে। নাম ডাক শুনে একদিন হজরত আমিনউদ্দিন সাক্ষাৎ করলেন তাঁর সঙ্গে। হজরত আমিনউদ্দিন মুগ্ধ হলেন হাজী সাহেবকে দেখে। কি সুন্দর মুখাবয়ব। আল্লাহ্র অলিগণের চেহারা এতই সুন্দর!

হজরত আমিনউদ্দিন দোয়ায়ে হেজবুল বাহার আমল করবার জন্য হাজী সাহেবের নিকট এজাজত চাইলেন। হাজী সাহেব ভালো করে চেয়ে দেখলেন

আমিনউদ্দিনের দিকে।হ্রস্ব আকৃতির সুন্দর স্বাস্থ্যবান চেহারা। জ্যোৎস্নার আলোর মতো কমনীয় অবয়ব। হাজী সাহেব চোখ ফেরাতে পারলেন না। বাংলার মাটির মতো মমতামাখানো এই ব্যক্তি কে? এই ব্যক্তির জন্যই কি তবে তাঁর অন্তরে বাংলা সফরের নেশা জেগেছিলো?

হাজী সাহেব তাঁকে নিজের তরফ থেকেই সিলসিলায়ে খাস মোজাদ্দেদিয়ায় দাখেল হবার দাওয়াত দিলেন। বললেন, 'সিলাসিলায়ে মোজাদ্দেদিয়া মে দাখেল হো যাইয়ে। আপ যো মাংতে হায় উছছে বেহতর দৌলত মিল জায়েগী আপকো।'

হজরত আমিনউদ্দিন বিস্মিত হলেন। কাদেরিয়া তরিকায় দীর্ঘ চল্লিশ বছর সাধনা করেছেন তিনি। কামালত অর্জন করেছেন। জীবনের শেষ দিকে এসে একি আহবান শুনলেন তিনি! কিন্তু হাজী সাহেবের চাউনির মধ্যে, মোবারক সহবতের মধ্যে কি এক দুর্বার শক্তি আছে— ইশ্‌কে এলাহির দুর্দমনীয় নেশা আছে। সে নেশায় ধীরে ধীরে প্রভাবান্বিত হতে থাকলেন হজরত আমিনউদ্দিন। আহবান অস্বীকার করতে পারলেন না তিনি। দাখেল হলেন নতুন তরিকায়।

সিলসিলায়ে মোজাদ্দেদিয়ার প্রথম তাওয়াজ্জোহ্‌তেই তিনি পেলেন এক অপূর্ব আস্বাদ— চল্লিশ বছরের সাধনাতেও যা তাঁর লাভ হয়নি। মোর্শেদের নির্দেশানুযায়ী নতুন তরিকায় পূর্ণোদ্যমে মোজহেদা শুরু করলেন তিনি। এই সিলসিলার শান, ফায়দা আদান প্রদানের পদ্ধতি, মোর্শেদ ও মুরিদের পারস্পরিক মহব্বতের উষ্ণতা— সব কিছু বিমোহিত করলো তাঁকে। তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললেন, 'চল্লিশ বছর পরে এই প্রথম এলমে মারেফতের বর্ণ পরিচয় শুরু হলো আমার।'

হজরত আমিনউদ্দিন হাজী সাহেবের নিকট বায়াত হবার পর হাজী সাহেবের নিয়ম কানুন সব কেমন পরিবর্তন হয়ে গেলো। আমিনউদ্দিনের জন্যই যেনো তিনি আজকাল বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কালুতলা গ্রামের প্রতিই যেনো তাঁর আকর্ষণ বেড়ে চলে দিন দিন। বিবি সাহেবকে নিয়ে মাঝে মাঝেই হাজির হন কালুতলায়। মেহমান হন হজরত আমিনউদ্দিনের দরিদ্র কুটিরে।

সম্পদশালী মুরিদেরা দাওয়াত করলে— তাঁর অভ্যর্থনা আপ্যায়নের জন্য বিরাট আয়োজন করলেও তিনি সেদিকে আকৃষ্ট হন না মোটেও। স্পষ্ট জানিয়ে দেন, 'নেহি। আমিনউদ্দিন কা ঘরমে জায়েঙ্গে। মহব্বত কা খানা। ডাল আওর রোটি।'

হজরত আমিনউদ্দিন একেবারে নির্ভেজাল বাঙ্গালী। উর্দ্দু হিন্দী তিনি বলতেও পারেন না। বুঝতেও পারেন না। হাজী সাহেবও একেবারে খাঁটি খান সাহেব।

উত্তর ভারতে প্রচলিত উর্দ্দু হিন্দী ছাড়া তিনি অন্য কোনো ভাষায় কথা বলতে পারেন না। বাংলায় এতোবার এসেছেন। এতদিন থেকেছেন। কিন্তু বাংলা বলতেও পারেন না। বুঝতেও পারেন না। দুজনের মধ্যে কথাবার্তা বলবার সময় দোভাষী নিযুক্ত করতে হয়।

কী বিস্ময়ের ব্যাপার! কেউ কারো কথা বুঝতে পারেন না। অথচ দুজনই দুজনের প্রেমে আত্মহারা। তাই হয়। এক আল্লাহ্‌র খাঁটি প্রেমিক যাঁরা— তাঁরা পরস্পর পরস্পরের প্রেমে আত্মহারা তো হবেনই। এখানে তো হৃদয়ের সম্পর্ক। কলিজার আদান প্রদান।

হাজী সাহেব কিছু বলতে চাইলে নাম ধরে ডাকেন, 'আমিনউদ্দিন— আমিনউদ্দিন।' যেনো নাম ডাকার মধ্যেই সব কিছু খুঁজে পান তিনি। তারপর যা বলেন নিজের ভাষায় বলেন।

দুই বুজুর্গ দুই রকম স্বভাবের। একজন সূর্যের প্রখর কিরণের মতো— হাজী রিয়াসত আলী খান শাহজানপুরী (রঃ)। আর একজন জ্যোৎস্নার আলোর মতো, স্নিগ্ধ মাটির মতো মমতামাখা— হজরত আমিনউদ্দিন (রঃ)।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই সিলসিলায়ে মোজাদ্দেদিয়ার কামালত হাসিল করলেন হজরত আমিনউদ্দিন। মুরাদ এবং মাহবুব সালেকগণের ক্ষেত্রে এরকমই হয়ে থাকে। তাঁরা অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুত গতিতে উপনীত হতে সক্ষম হন উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে।

খেলাফত লাভ করলেন হজরত আমিনউদ্দিন। তাঁর খেলাফত লাভের পর থেকে হাজী সাহেব ভাবতে শুরু করলেন, মনে হয় বাংলা সফরের প্রয়োজন তাঁর ফুরিয়ে আসতে শুরু করেছে। বাংলায় প্রজ্জ্বলিত হয়েছে সিলসিলায়ে খাছ মোজাদ্দেদিয়ার সমুজ্জ্বল প্রদীপ। বাংলার পতঙ্গদলের প্রেম পিপাসা মিটাবার জন্য এই শামাদানই এখন যথেষ্ট।

নতুন কাজ শুরু করতে হলো হজরত আমিনউদ্দিনকে। এ কাজ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি মহান। এ কাজ নূর বিতরণের কাজ। পাপী আদম সন্তানদের হৃদয়ে ইশ্‌কের অনল জ্বালবার কাজ।

ধীরে ধীরে সালেকের ভীর বাড়তে থাকলো হজরত আমিনউদ্দিনের দরবারে। বিরামহীনভাবে তিনি জারি করে দিলেন ইশ্‌কে ইলাহীর ফয়েজ মানুষের অন্তরে অন্তরে।

তাঁর ছোটো মসজিদে বসে প্রেমের মহফিল। মুরিদগণকে নিয়ে তিনি আল্লাহ্পাকের জিকিরে ও মোরাকাবায় মশগুল হয়ে যান। আত্মবিস্মৃত হয়ে যান।

হজরত আমিনউদ্দিন এক বিস্ময়কর বুজুর্গ। আড়ম্বরহীন শান শওকতহীন নিরাবরণ মাটির মতো শাদা মাটা সরল তাঁর জীবনধারা।

কোনো এলাকা থেকে মুরিদ, ভক্তবৃন্দ আমন্ত্রণ জানালে তিনি যেতে রাজি হয়ে যান সহজেই। মুরিদগণ নৌকা ভাড়া দিয়ে গেলেও তিনি নৌকায় ভ্রমণ করেন না। নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে উপস্থিত হন নির্দিষ্ট স্থানে। তারপর মুরিদগণের ছেলেমেয়েদেরকে ডাকেন— আদর করে তাদের হাতে নৌকা ভাড়ার টাকাটা তুলে দিয়ে বলেন, 'খোকা খুকীদের মিষ্টি খাওয়ার জন্য দিলাম। আমার নৌকা লাগেনি। হাঁটতে হাঁটতেই এসেছি।'

কোনো মুরিদ হাদিয়া স্বরূপ টাকাকড়ি দিলে তিনি গ্রামের গরীব কোনো লোককে ডাক দেন। সামনের ভিটের মাটি কোপানোর কাজে লাগিয়ে দেন। পুরো দিন যেতে না যেতেই হাদিয়ার টাকায় তাকে মজুরী দিয়ে বিদায় দেন।

একদিন বাজারে গিয়েছেন হজরত আমিনউদ্দিন। সওদাপাতি কিছু কেনা কাটার দরকার। নজরে পড়লো এক কোনে এক বুড়ো মানুষ কিছু শাক এবং কিছু কচি কাঁচকলা নিয়ে বসে আছে। দেখেই মনে হয়, অভাবী লোক। আহা অভাব না হলে অপরিপক্ক কলা আর পোকা খাওয়া শাক নিয়ে কেউ বাজারে আসে। কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন হজরত আমিনউদ্দিন। তার সওদা কেউ কেনে না। শেষে তিনিই তার সমস্ত সওদা কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন।

তাঁর বিবি সাহেবা বাজার দেখে বলে উঠলেন, 'তুমি কি চোখের মাথা খেয়েছো। বাড়িতেই তো এর চেয়ে ভালো কাঁচকলা আছে, শাক আছে। আর তুমি বাজার থেকে নিয়ে এসেছ ফুলোকলা আর পোকাধরা শাক।'

হজরত আমিনউদ্দিন অপ্রস্তুত হয়ে বলেন, 'কি করবো বল, লোকটার সওদা কেউই যে কিনতে চায় না। ওগুলো না বেচতে পারলে তার বাড়িতে যে সবাইকে উপোস করে থাকতে হতো।'

একবার অনেক রাতে এক চোর এলো তাঁর বাড়ীতে। বারান্দায় ধানের বস্তা সাজানো ছিলো। ওখান থেকে একটা বস্তা মাথায় তুলতেই ঘর থেকে বের হলেন আমিনউদ্দিন। প্রায় সারারাত জেগেই কাটাতেন তিনি। চোরের সামনে এসে তিনি ফিস্ ফিস্ করে বললেন 'বাবা, এদিকের পথ দিয়ে যাও। সদর রাস্তায় পাহারাদার আছে। ওদিকে গেলে ধরা পড়ে যাবে।'

চোর মন্ত্রমুগ্ধের মতো হজরতের কথামতো পিছনের পথ দিয়ে ধানের বস্তা মাথায় করে নিয়ে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছলো। কিন্তু সকালে কিছু বেলা উঠতেই অদ্ভুত ভাবান্তর হলো তার। চুরি করা ধানের বস্তা আবার মাথায় নিয়ে হজরতের কাছে গিয়ে তাঁর সামনেই মাটিতে বস্তা রেখে বললো, 'হুজুর চুরি আর করবো না। আমাকে মুরিদ করে নিন।'

যৌবনে পা দিয়েছেন আবদুল হাকিম। তাঁর বেপরোয়া স্বভাব আরো বেড়ে গিয়েছে আজকাল। মাঝে মাঝে দীর্ঘ দিন ধরে কোথায় যেনো উধাও হয়ে যান। বছর পার হয়ে যায়। তবু কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না তাঁর।

একবার যান কাশী। ছদ্মবেশে ঢুকে পড়েন বড় বড় মন্দিরে। ঘুরে ফিরে দেখেন মন্দিরের ভিতরে কি থাকে। পুরোহিতরা কি রকম। কোনোকিছু দেখতে ইচ্ছে করলে তার আদ্যোপান্ত না দেখা পর্যন্ত নিবৃত্ত হন না তিনি। অলৌকিক কোনো কিছুর প্রতি তাঁর আগ্রহ দিন দিন প্রবল হয়ে ওঠে। যাদু বিদ্যা, ম্যাজিক এসবের প্রতি অধিকমাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েন তিনি। যেমন করেই হোক, এসব বিষয়বস্তু তাঁকে করায়ত্ব করতেই হবে। আর সেজন্য সন্ধান করে করে গুণী গুরুর দ্বারস্থ হন। এক গুরুর শিক্ষা শেষ হলে আর এক গুরুর তালাশে বেরিয়ে পড়েন।

একবার সন্ধান পেয়ে হিমালয়ের কাছাকাছি চলে গেলেন। সেখানে এক গুহায় থাকেন বিরাট এক সিদ্ধ পুরুষ। তার কাছে অনেক কিছু যাদু বান শিক্ষা করলেন তিনি। শিক্ষা শেষে বিদায়ের সময় জানিয়ে দিলেন নিজের পরিচয়, 'আমি কিন্তু মুসলমান। আমার নাম আবদুল হাকিম।'

চমকে ওঠেন গুরু। ম্লেচ্ছ-যবন কিনা তারই সঙ্গে এতদিন বসবাস করেছে। শেষে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন, 'তা হোক বাবা, শিক্ষায় কোনো জাতিভেদ নেই।'

যাদু ম্যাজিক শিখে এসে চারিদিকে যাদু দেখাতে শুরু করে দিলেন আবদুল হাকিম। কলকাতা শহরে, আরো অনেক ছোট খাট শহরে একে একে হতে থাকে তাঁর যাদু প্রদর্শনী। পয়সা কড়িও আয় হতে থাকে প্রচুর। নিজের জন্য দামী দামী জামা কাপড় কেনেন। দামী সখের জিনিস কেনেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা পয়সা বেপরোয়াভাবে খরচ করতে থাকেন। টাকা পয়সা জমিয়ে রাখা তিনি একবারেই পছন্দ করেন না।

অনেকদিন পর পর বাড়ি ফিরে আসেন তিনি। দেখেন, কালুতলায় লোকজনের ভিড় বেড়ে গিয়েছে। তাঁর পিতার মুরিদের দল ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একদিন তাঁর খেয়াল হলো, শাহজানপুর যাবেন। তাও যাবেন সাইকেলে এবং এক নয় দু'জন মিলে একই সাইকেলে। সঙ্গীও জুটে গেল একজন, লোকে তাকে 'ঝড়ো কাজী' বলে ডাকে। তাকে বললেন আবদুল হাকিম, 'চলো দিল্লী যাবো। আব্বার পীর সাহেবের বাড়ি দেখে আসবো।'

যেই কথা সেই কাজ। দু'জন মিলে একটা পুরনো সাইকেল নিয়ে কালুতলা থেকে দিল্লী রওয়ানা হলেন। এখান থেকে প্রায় হাজার মাইলের পথ দিল্লী শাহজানপুর। কুছ পরোয়া নেহি।

কয়েকদিন পর শাহজানপুর হাজির হলেন আবদুল হাকিম। কিন্তু কোথাও বেশীদিন থাকার ছেলে নন তিনি। তাই দু'চারদিন যেতে না যেতেই সেখান থেকে আবার উধাও হয়ে যান।

তখন সারা ভারতের কোণায় কোণায় বৃটিশবিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে। হঠাৎ এদিকে আকৃষ্ট হলেন আবদুল হাকিম। নেতাজী সুভাষ বোসের দলের সঙ্গে হৈ চৈ করে বেড়ালেন কিছুদিন। কিছুদিন পর একাজও ভালো লাগলো না আর। তখন ভর্তি হলেন গিয়ে ইউ,পি, ফকিরের দলে।

ইউ,পি, ফকির চিশতিয়া তরিকার একজন কামেল বুজুর্গ ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার জন্য বৃটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ করার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। শ'তিনেক মুরিদ নিয়ে তিনি গঠন করেছিলেন সন্ত্রাসবাদী দল। এর প্রধান কার্যালয় স্থাপন করেছিলেন সীমান্ত প্রদেশের এক দুর্ভেদ্য পর্বতে। কেউ তার দলে ভর্তি হতে চাইলে তাকে কঠিনভাবে পরীক্ষা করা হতো। আগুনে লোহা পুড়ে লাল টকটকে হয়ে গেলে হাতের কবজির কাছে জোরে ঠেসে ধরা হতো জলন্ত লোহা। আর ঐ সময় চোখের দৃষ্টি রাখতে হতো একেবারে স্বাভাবিক অবস্থায়। মুখ কুঁচকানো তো দূরের কথা। চোখের পাতা একটু নড়লেই তাঁকে আর দলে নিতেন না ইউ,পি, ফকির। আবদুল হাকিম তাঁর দলে ভর্তি হতে চাইলে তাঁকেও দিতে হলো এই কঠিন পরীক্ষা। অন্য রকম উপাদানে গড়া আবদুল হাকিমের নিকটে এসব তো ডালভাত। পরীক্ষায় সহজেই পাশ করলেন তিনি।

ইউ,পি, ফকিরের দলে তিনি অস্ত্র চালনার ট্রেনিং নিলেন। বন্দুক রাইফেল চালানো শিখলেন। দলের সঙ্গে এখানে ওখানে অপারেশন চালালেন। এ কাজ তো বেশ মজাদার কাজ।

ইউ,পি, ফকির খুব ভালবাসতেন তাঁর শাগরিদেরকে। কিছু কিছু কারামতও ছিলো তাঁর। সকালে নাস্তার পর তিনশ' শাগরিদদের প্রত্যেককে একটা করে খালি কাপ দিয়ে বসিয়ে দিতেন। তারপর একটা ছোট কেটলিতে করে সবার কাপ চা দিয়ে ভরে দিতেন। যে কেটলিতে চার পাঁচ জনের বেশী থাকার কথা নয়, সেই কেটলির চায়েই তিনি শ'তিনেক মুরিদকে চা পান করাতেন।

কোনো কাজে দীর্ঘদিন আটকে থাকা ছিলো আবদুল হাকিমের স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ। কিছুদিন পর একাজও ছেড়ে দিলেন তিনি। বাড়ী ফিরে এলেন। কিছুদিন চুপচাপ থাকলেন। তারপর আবার এখানে ওখানে যাদু দেখিয়ে বেড়াতে লাগলেন।

হজরত আমিনউদ্দিন দোয়া করেন ছেলের জন্য। তাঁর মাও দোয়া করেন। ছেলে এরকম ভবঘুরের মতো কতোকাল ঘুরবে আর। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর অন্তরকে যেনো দ্বীনের দিকে রুজু করে দেন।

লোকে বলে, 'হুজুর আপনি এতোবড় বুজুর্গ মানুষ আর আপনার ছেলে কিনা যাদু দেখিয়ে বেড়ায়। এর একটা বিহিত করুন।'

তাইতো। কি করা যায়। এর একটা বিহিত করা দরকার। হজরত ভেবে চিন্তে ঠিক করলেন, জোয়ান ছেলে, বিয়ে দিলে হয়তো মনের পরিবর্তন আসতে পারে। কিন্তু তাও তো সম্ভব নয়। জোয়ান ছেলে। এ বয়সে সব জোয়ান ছেলেরাই বিয়ের জন্য উৎসুক হয়। কিন্তু ওযে অন্য সবার মতো নয়। যখন যা নিয়ে মাতে তার শেষ না দেখা পর্যন্ত অন্য দিকে মন ফিরায় না।

হজরত আমিনউদ্দিন ঠিক করলেন, যে করেই হোক ছেলেকে এবার বিয়ে দিতেই হবে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে বিয়ে ঠিকও করে ফেললেন তিনি। মা বাপের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হলো আবদুল হাকিমকে।

বিয়ের পর আবদুল হাকিমের মতি গতির কিছু পরিবর্তন আসে। সেই ভবঘুরে ভাবটা যেনো সামান্য স্তিমিত হয়েছে। মনে হয়, কোনো অচিন দেশের দুঃসাহসী সওদাগর এবার নোঙরের কদর বুঝতে শিখছে। কিন্তু এ পরিবর্তন তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। আগের মতোই তিনি হঠাৎ হঠাৎ উধাও হয়ে যেতে থাকেন মাঝে মাঝে। তবে এখন বাইরে আর থাকেন না বেশী দিন। ঘরের টান জন্মেছে।

দিন যায়। রাত যায়। মাসের পরে মাস যায়। বছর চলে গিয়ে আবার আসে নতুন বছর। সময়ের নহর এমনিভাবে নীরবে বয়ে চলে। বিরতিহীন। বিরামহীন।

আবদুল হাকিমের চিন্তায় স্বভাবে ইদানিং কেমন এক ধরনের পরিবর্তন এসেছে। চপল চঞ্চল অভিব্যক্তির মধ্যে হঠাৎ কখনো উদাস গম্ভীর ভাব ফুটে ওঠে। কিন্তু যাদু প্রদর্শনের নেশা তাঁর কাটেনি। বেপরোয়া ভাবটা নেই বটে তবু দীর্ঘদিন সাধনা করে পাওয়া যাদুবিদ্যার প্রতি এখনো তাঁর মোহ কাটেনি।

হজরত আমিনউদ্দিন দোয়া করেন ছেলের জন্য। ছেলের মনের পরিবর্তনের জন্য, হেদায়েতের জন্য। লোকে বলে, আপনি পীর বুজুর্গ মানুষ আর আপনার ছেলে কিনা যাদুকর।'

হজরত আমিনউদ্দিন বলেন, 'খোকা— ওসব ছেড়ে দিলে হয় না। এবার দ্বীন ধর্মের দিকে ফিরে এসো!'

আবদুল হাকিম তেমন আমল দেন না এসব কথার। জানিয়ে দেন, 'অনেক সাধনা করে তবে পেয়েছি এসব। আপনার চেয়ে কম বিদ্যে নেই আমার। আপনার মতো আমিও রাখি আধ্যাত্মিক শক্তি।'

কিছুদিন পর হজরত আমিনউদ্দিন বললেন, 'ঠিক আছে। তোমার আমার শক্তি পরীক্ষা হবে এবার। যাও অজু করে এসো আমার সামনে। সামনা সামনি এবার আধ্যাত্মিক শক্তির পরীক্ষা হবে।'

আবদুল হাকিম রাজী হয়ে গেলেন সহজেই। এইতো চান তিনি। লড়াই, সংঘর্ষ–শক্তি পরীক্ষা। তিনি অজু করে এসে বসলেন পিতার সামনে। আধ্যাত্মিক শক্তি নিক্ষেপ করলেন তাঁর পিতার প্রতি।

হজরত আমিনউদ্দিন মোজাদ্দেদিয়া সিলসিলার কামেল মোকাম্মেল বুজুর্গ। এ যে সোনার সিলসিলা। এ সিলসিলা যে কামালতে নবুয়তের নূরে সমৃদ্ধ ও শক্তিময়। একজন নবী যেমন তাঁর নবুয়তের শক্তি দ্বারা সমসাময়িক বিরোধী কওমকে বশীভূত করেন। একজন রসূল, একজন উলুল আজম পয়গম্বর যেমন তাঁদের রুহানী পদ-মর্যাদার অনুকূলে কুওত দ্বারা নিজ নিজ কওমের উপরে প্রতিষ্ঠিত করেন নিরঙ্কুশ বিজয়— এই সিলসিলার বুজুর্গগণও নবী রসূল না হওয়া সত্ত্বেও, তাঁদের ফয়ুজাতের নহরে অবগাহন করে আল্লাহ্‌র দেওয়া আধ্যাত্মিক শক্তিতে রঞ্জিত হয়ে কুফরির শক্তিকে করেন পর্যদুস্ত, পদানত।

হজরত আমিনউদ্দিন নিজের সন্তানের উপরে নিক্ষেপ করলেন তাওয়াজ্জোহ্। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। আবদুল হাকিম লক্ষ্য করলেন, তাঁর সঞ্চিত আধ্যাত্মিক শক্তি কর্পূরের মতো কোথায় যেনো উড়ে গেছে।

বিস্মিত হলেন তিনি। তাঁর নিজের গৃহে এ কোন্ শক্তির চর্চা হয়। বনে জঙ্গলে, হিমালয়ে এতদিন তাহলে কিসের নেশায় ছুটেছেন তিনি। কিসের আকর্ষণে এখান থেকে ওখানে দিনের পর দিন ছুটে চলেছিলেন এতদিন। আশ্চর্য! কি ছিলো অন্তরের মূল দাবী— কেমন ছিলো হৃদয়ের প্রকৃত পিপাসা— তাতো তিনি জানতে পারেননি এতকাল। অন্তরে এ কোন্ প্রেমের ঢেউ মাতামাতি শুরু করে দিয়েছে! বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিধারার মতো, অশান্ত স্রোতস্বিনীর প্রবাহের মতো সমস্ত দেহমন জুড়ে বর্ষিত হচ্ছে এ কোন্ অপার্থিব আনন্দ ধারা। কে জানতো আগে অন্তরে এতো প্রেমের পিপাসা ছিলো, উন্মাতাল আর্তি ছিলো। কে জাগাতে পারে জীবনকে। কে দেয় ধুধু মরুর খরতাপে শ্যামল মরুদ্যানের সন্ধান। অনন্তের যাত্রাপথে কে হয় রাহবার। সাথী। দিলের দোসর। মোর্শেদ। মহান মোর্শেদ।

এ পথ বন্ধুর। তুহিন তিমিরের মতো। এ পথে চড়াই, উৎরাই আছে। মঞ্জিলে মঞ্জিলে দিতে হয় প্রেমের প্রমাণ, কঠিন পরীক্ষা। মাশুকের দরবারের দিকে কদম রাখতে হয় অতি সন্তর্পণে। মোর্শেদের হৃদয়ে হৃদয় ঘষে জ্বালাতে হয় ইশকের

আলো। সে আলোয় পথ চিনে নিয়ে দৃঢ়তাদীপ্ত সমুদ্র মন্থনকারী সাহসী নাবিকের মতো, বিজয়ী সিপাহ্সালারের মতো মারেফতের অন্তহীন মঞ্জিলের পানে চলতে হয়। চলতেই হয় বিরামহীনভাবে।

হজরত আমিনউদ্দিন দুই হাত প্রসারিত করে দিলেন। মোর্শেদের মহব্বতে তখন উন্মুখ হয়ে আছে আবদুল হাকিমের সারা অন্তর। তিনি হাত বাড়ালেন। অনুষ্ঠিত হল চুক্তিনামা, প্রেমের বন্ধন। আনুগত্যের শপথ উচ্চারিত হলো। আল্লাহ্র রেজামন্দি হাসেলের জন্য, প্রভুর মারেফত অর্জনের জন্য প্রকৃত প্রতিপালকের পথে আমৃত্যু অটলভাবে দাঁড়িয়ে থাকবার অঙ্গীকার— বায়াতনামা।

বায়াত হবার পর পরই হৃদয় থেকে প্রেমের আগুন ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত অবয়বে। সমস্ত শরীরের প্রতিটি রক্তকণিকায়, ধমনীর স্পন্দনে, অস্থির প্রতিটি অস্তিত্বে মুহূর্তেই শুরু হয়ে গেলো আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকিরের উন্মত্ততা। মাশুক স্মরণের একি অনির্বচনীয় আস্বাদ। দুনিয়া ও আখেরাতের সবকিছুই যে তুচ্ছ মনে হয় এর কাছে।

হজরত আবদুল হাকিম মোর্শেদের দরবারে আরজ করলেন, 'এখন কি হুকুম আপনার। আমাকে কি জঙ্গলে যেতে হবে।'

হজরত আমিনউদ্দিন বললেন, না। তারপর তিনি সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেন সিলসিলায়ে মোজাদ্দেদিয়ার শিক্ষা পদ্ধতি এবং তার বিশেষত্বের বিবরণ। বনে জঙ্গলে নয়। গৃহে থেকেই, যাবতীয় গৃহকর্মের মধ্য দিয়েই তালাশ করতে হবে আল্লাহ্পাকের মারেফত, প্রেম। নির্জন স্থানে পালিয়ে গিয়ে নয়— জনতার কোলাহলের মধ্যেই এখতেয়ার করতে হবে নির্জনতা। বাহিরের কোথায় নয়— মাশুকের পরিচিতি অনুসন্ধান করতে হবে নিজেরই অস্তিত্বের আয়নায়। পথ অতিক্রমণে থাকতে হবে প্রেমময় গতিময়তা। পরবর্তী মঞ্জিলের প্রতি রাখতে হবে স্থির নজর— যা থাকবে লক্ষ্যভ্রষ্টতার আশংকা থেকে মুক্ত। এসবের সংক্ষিপ্ত নাম, হুঁশ হরদম, নজর বর কদম, সফর দর ওয়াতন এবং খেলাওয়াত্ দর আঞ্জুমান। সমস্ত পূর্ণতা ও উৎকর্ষতা অনুসন্ধান করতে হবে রসূলেপাক (সঃ) এর অনুসরণের পূর্ণতার মধ্যে। কামালে ইত্তেবায়ে সুন্নাহ্ হচ্ছে কামালত লাভের চাবিকাঠি।

তরিকতের প্রয়োজনীয় জিকির আজকার মোরাকাবা মোশাহাদার নিয়ম কানুন শিখিয়ে দিলেন তিনি হজরত আবদুল হাকিমকে। তারপর পাঠালেন বশিরহাট শহরের এক বিজ্ঞ কবিরাজের কাছে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করার জন্য, যাতে সংসারের ব্যয় নির্বাহের জন্য একটা অসিলা অবলম্বন করা যায়। আল্লাহ্পাকই রাজ্জাক। রিজিক দাতা। কিন্তু রিজিকের জন্য অসিলা অবলম্বন করা তাঁর হাবীবের সুন্নত।

মোর্শেদের হুকুম নির্দ্বিধায় মেনে নিলেন তিনি। আল্লাহ্পাকের দোস্তগণের মজলিশে যাঁরা লাভ করেন নির্ধারিত আসন, এরকম স্বভাবের অধিকারীই হন তাঁরা। নির্বিবাদে মেনে নেন মোর্শেদের সকল নির্দেশ।

আবদুল হাকিম এখন আর যাদুকর নন। এখন তিনি তওবাকারী। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'তওবাকারীর বিগত জীবনের অপরাধসমূহ তিনি পুণ্যে রূপান্তরিত করে দেন।' আল্লাহ্পাকের হাবীব এরশাদ করেছেন, 'অপরাধ হতে প্রত্যাবর্তনকারী ব্যক্তি নিষ্পাপ শিশুর মতো।'

আবদুল হাকিম এখন তওবাকারী। তাঁর সমস্ত অবয়ব জুড়ে এখন নূরের সমাহার। অন্ধকার রাজ্যের সঙ্গে তিনি এখন পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্যুত। তিনি এখন আলোর মজলিশে মেহমান। এবার পেয়েছেন তিনি জীবনের মতো জীবন— যে জীবনে আছে সুন্নতের প্রদীপ্ত শামাদান— যে জীবনে মৃত্যুর ভয় নেই, বিভ্রান্তির জড়তা নেই। যে জীবন প্রকৃত অর্থেই জীবন। সফল জীবন। সার্থক জীবন।

আবদুল হাকিমের এই অভাবিত জীবন স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁদেরকে, যাঁরা ছিলেন খাঁটি তওবাকারী। সেই ওমর ফারূক (রাঃ)। নবীজির (সঃ) জানের দুশমন ছিলেন তিনি। যখন প্রত্যাবর্তন করলেন আলোর মিছিলে, পেলেন মহামূল্যবান ফারূক উপাধি।

সেই মুসলমানদের তিক্ত শত্রু খালেদ বিল ওলিদ (রাঃ)। তওবা করবার পর তিনিই হলেন সাইফুল্লাহ্ (রাঃ)।

সেই ওমর বিন আবদুল আজিজ (রঃ)। আল্লাহ্প্রেমের অনলে দগ্ধ হতে চাইলেন যখন, মুহূর্তেই ছিন্ন হলো ভোগবিলাসে আবদ্ধ প্রবৃত্তির অমানিশা।

এইরূপ দৃষ্টান্ততো জগতে একটি দুটি নয়, বহু আছে। হাদিস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, 'প্রত্যেক বনি আদমই গোনাহ্গার— তাঁরাই উত্তম যাঁরা তওবা করেন।'

নবীজীর স. কথা তাঁদের জীবনে সফল হয়েছে। তাঁরাই উত্তম ব্যক্তিদের কাতারে স্থাপন করেছেন নিজেদের স্থায়ী আসন যারা বুঝেছিলেন তওবার মর্মার্থ, গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা। বুঝেছিলেন হজরত ফুজায়েল ইবনে আয়াজ (রঃ)। ডাকাত দলের সর্দার ছিলেন। লুট করতেন নিরীহ নিরপরাধ মানুষের সম্পদ। কিন্তু এ কাজ তাঁকে আটকে রাখতে পারলো না শেষ পর্যন্ত। তিনি তওবা করলেন। বিনিময়ে আল্লাহ্পাক তাঁকে দান করলেন সে জামানার শ্রেষ্ঠ অলীর মর্যাদা। এমন প্রখর নূরাণী রূহানী পদমর্যাদা হাসেল হলো তাঁর যেখানে দৃষ্টিপাত করতেও অন্তরচক্ষু অক্ষম হয়।

তওবার অর্থ বুঝেছিলেন হজরত বেশার হাফি (রঃ)। মাতাল ছিলেন তিনি। বাইজি বাড়ীতে পড়ে থাকতেন সবসময়। আনন্দ করতেন, ফুর্তি করতেন।

একদিন রাতে ঘরে ফিরবার সময় হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো রাস্তায় পড়ে আছে এক টুকরো ছোটো কাগজ। তাতে আল্লহ্পাকের নাম লেখা। শরাবখোর বেশার চমকে উঠলেন। আহা এযে আল্লাহ্র নাম। এযে আমার প্রভুর নাম, মালিকের নাম। কাগজটি তুলে নিলেন তিনি। পরিষ্কার করলেন তার ধূলোবালি। তারপর ঘরে এনে কাগজটি একটি তাকে অতি যত্নে রেখে দিলেন।

তৎকালীন অলিশ্রেষ্ঠ হজরত হাসান বসরি (রঃ) এর নিকট আল্লাহ্পাক এলহাম করলেন, তুমি যাও বেশারকে খবর দাও, সে যেমন আমার নামের সম্মান করে

আমার নাম লেখা কাগজটি সসম্মানে তাকে তুলে রেখেছে, তেমনি প্রতিদানস্বরূপ আমিও তাঁর নাম আমার অলিগণের তালিকায় লিখে রেখেছি।

বেশার হাফির নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছলো, তিনি তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তওবা করলেন। পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হয়ে গেলেন মাওলার প্রেমের সীমাহীন দরিয়ায়। পরবর্তী সময়ে ইমাম আহামদ বিন হাম্বল (রঃ) এর মতো মুজতাহিদ ইমামও তাঁর সহবত এখতেয়ার করে ধন্য হয়েছিলেন।

প্রত্যাবর্তনের অর্থ বুঝেছিলেন হজরত হাবীব আজমী (রঃ)। সুদখোর ছিলেন তিনি। যখন তওবা নসিব হলো তাঁর তিনি হলেন আল্লাহ্পাকের নৈকট্যপ্রাপ্ত বন্ধু। দুনিয়া আখেরাত সবখানেই তিনি পেলেন প্রভূত সম্মান, অতুলনীয় মর্যাদা।

নবীজী (সঃ) ঠিকই বলেছেন, 'প্রত্যেক বনি আদমই গোনাহ্গার। তাঁরাই উত্তম যাঁরা তওবা করেন।'

আল্লাহ্পাক যাঁকে হেদায়েত করেন, তিনিই হেদায়েত পান। হেদায়েত মানুষের হাতে নয়। তিনি যে স্তরের মানুষ হন না কেনো। নবী, রসূল, অলি আল্লাহ্ কেউই হেদায়েত করতে পারেন না। তাঁরা শুধু আল্লাহ্পাকের দরবারে মানুষের মঙ্গলের জন্য, মানুষের হেদায়েতের জন্য দোয়া করে থাকেন। দোয়া যদি আল্লাহ্পাকের দরবারে মকবুল হয়, তবেই তা বাস্তবায়িত হয়। দোয়া কবুল করা বা না করা সম্পূর্ণ আল্লাহ্পাকের এখতিয়ার। তিনি ইচ্ছাময়। তাঁর যা ইচ্ছা হয়, তাই করেন তিনি। তাঁর কার্যকলাপের জন্য কারো নিকট জবাবদিহী করতে হয় না তাঁকে। তিনি যে মালিক, দয়াময় প্রভু। তাঁর ইচ্ছার মধ্যে, তাঁর গুণাবলীর মধ্যে, তাঁর জাতের মধ্যে অসুন্দর বলে কিছু নেই। যা অসুন্দর, ত্রুটিপূর্ণ, ক্ষয় ক্ষতির কলঙ্কে কলঙ্কিত তা তাঁর জাত, সেফাত ও আফয়াল থেকে বাইরে। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। বরং সমস্ত সৃষ্টি জগতই তাঁর অস্তিত্বের জন্য, স্থায়িত্বের জন্য এবং পূর্ণতার জন্য তাঁরই মুখাপেক্ষী। তিনি পবিত্র, দয়াময়, প্রেমময়। মাটির মানুষের প্রতি তাঁর দয়ার সীমা পরিসীমা নেই। তাঁর সিদ্ধান্তে কোনো ত্রুটি নেই, অপূর্ণতা নেই। অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতার দিকে, মিথ্যা থেকে সত্যের দিকে, অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বের দিকে পথ প্রদর্শন করেন তিনিই। হেদায়েত করেন তিনিই। তিনি যাঁকে হেদায়েত করেন, তাঁকে তাঁর রসূল, নবী কিংবা কোনো নায়েবে-নবীর সঙ্গে মহব্বতের বন্ধনে, আনুগত্যের বন্ধনে সম্পর্কযুক্ত করে দেন। আল্লাহ্পাকের নির্বাচিত বান্দাগণের সঙ্গে, আল্লাহ্পাকের নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাগণের সঙ্গে এই প্রেম বন্ধনের ফলেই পাপী মানুষ শেষ পর্যন্ত উপনীত হতে সক্ষম হন তাঁর পাক দরবারে। এই নিয়মই হচ্ছে হেদায়েত প্রাপ্তির নিয়ম। মানুষ কাউকে ভালবাসলে আল্লাহ্পাক তাঁকে হেদায়েত প্রদান করতে বাধ্য নন। বরং তিনি যাঁকে পছন্দ করেন, তাঁরই হেদায়েত নসিব হয়। আল্লাহ্পাক যাবতীয় ঔচিত্য ও বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত, পবিত্র।

এই জন্যই দেখা যায়, সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর যিনি, সমগ্র সৃষ্টির কারণ যিনি, আল্লাহ্পাকের প্রেমাস্পদ যিনি, তাঁর নিজের চাচা আবু তালেবের হেদায়েতের জন্য দোয়াও আল্লাহ্পাকের দরবারে না মঞ্জুর হয়। আবার তাঁর অপর এক চাচা সাইয়েদুস শোহাদা হজরত আমীর হামজা (রাঃ) এর হত্যাকারী হাবশী গোলাম হজরত অহশী (রাঃ) লাভ করেন হেদায়েত। লাভ করেন রসূলেপাক (সঃ) এর সাহাবী হবার মতো দুর্লভ সৌভাগ্য।

কোনো বিষয়ে সফলতা অর্জন করতে গেলে সাধনা প্রয়োজন। যার সাধনার মধ্যে যতো আন্তরিকতা থাকবে, যার সাধনার মধ্যে যতো একনিষ্ঠতা, একাগ্রচিত্ততা থাকবে তিনি দেখবেন ততোখানি সফলতার সৌন্দর্য।

শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি তখনও নবী ছিলাম যখন আদম (আঃ) কাদা ও মাটির মধ্যে ছিলেন।' কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথিবীতে এসে নবুয়তের প্রায়োগিক দায়িত্ব প্রাপ্তির জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হলো দীর্ঘ চল্লিশটি বছর। হেরার গুহায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটাতে হলো গভীর ধ্যানে। কতো চড়াই উৎরাই, কতো বিপদ মুসিবতের মধ্যেও সমুদ্রবক্ষে তুফান কবলিত কিশ্তির দক্ষ নাবিকের মতো মকছুদ মঞ্জিলে পৌঁছবার সাধনায় অটল থাকতে হলো তাঁকে। তারপর এলো সম্পূর্ণ সফলতা। আসলে নবুয়ত তো কোনো সাধনালব্ধ জিনিস নয়। এমন কোনো সাধনাই হতে পারে না, যা নবুয়ত লাভের উপযোগী হতে পারে। এতো আল্লাহ্পাকের ফজল— তিনি যাকে খুশী তাকেই এই অনুগ্রহ দান করেন। কিন্তু এই অনুগ্রহ শর্তমুক্ত নয়। কঠোর সাধনা এই অনুগ্রহের শর্তরূপে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়।

বেলায়েতও তেমনি। যেহেতু নবুয়তের অনুসরণের কারণেই বেলায়েত হাসেল হয়, তাই নবীদের মতো অলীদের জন্য আরোপিত হয় কঠোর মোজাহেদা, নিরলস সাধনার শর্ত।

এই সাধনারও প্রকার ভেদ আছে। আছে সাধনা সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। নির্জন ইবাদত, সংসারের মোহ থেকে মুক্ত থাকা, রাত্রি জাগরণ অল্প আহার ইত্যাদিকে সাধনার মাধ্যম করতে অভ্যস্ত আমাদের সাধারণ সুফী সাধকগণ। কিন্তু নকশ্বন্দিয়া সিলসিলার সাধনার প্রকৃতি অন্যরকম। অন্তরের অন্তঃস্থলে আল্লাহ্র বিরতিহীন স্মরণ (জিকির) প্রতিষ্ঠার কাজে সদাসতর্ক থাকাই এই তরিকার সাধনার মূল কথা। এর জন্য নির্জনতা, চিল্লাকাশি, সমস্ত রাত্রি জাগ্রত অবস্থায় ইবাদত

বন্দেগীতে অতিবাহিত করার প্রয়োজন নেই। এর জন্য তেজারত, সাংসারিক প্রাত্যাহিক কাজ কর্ম বন্ধ রাখারও কোনো প্রয়োজন নেই।

এ তরিকার বিশেষত্ব সম্পর্কে ইমামুত্ তরিকত হজরত বাহাউদ্দিন নকশ্‌বন্দ (রঃ) এরশাদ করেছেন, একই সঙ্গে নিজের বাহ্যিক দেহকে দুনিয়ার সঙ্গে এবং অন্তরকে আল্লাহ্‌পাকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অবস্থায় রাখাই আমাদের তরিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

কালামুল্লাহ্ শরীফেও এই পথের পথিকগণের প্রকৃতি সম্পর্কে আল্লাহ্‌পাক বর্ণনা করেছেন। 'তাঁরা এমন এক দল যাঁদেরকে ক্রয় বিক্রয় তেজারত কোনো কিছুই আল্লাহ্‌পাকের জিকির থেকে অমনোযোগী রাখতে পারে না।'

এই তরিকায় তাই দুনিয়া ও আখেরাত একে অপরের প্রতিবন্ধক নয়। দুনিয়ার কাজে লিপ্ত থাকা এই তরিকার সাধনার পথে, কামিয়াবির পথে কামালিয়াত লাভের পথে অন্তরায় নয়। তাই বিশাল হিন্দুস্তানের বাদশাহীর দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও এই সিলসিলার কামেলে মোকাম্মেল পীর বাদশাহ আওরঙ্গজেবের সাধনায়, মোজাহেদায় কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি হয়নি। এই পদ্ধতিতে একজন মানুষ যে কোনো হালাল পেশায় নিযুক্ত থেকে একই সঙ্গে দুনিয়ার কামিয়াবি এবং আখেরাতের কামিয়াবি হাসেল করতে সক্ষম হন। নকশ্‌বন্দিয়া সিলসিলার এই ধারণা পরিপূর্ণ সুন্নতের অনুসরণ শেখায়। পূর্ণ দ্বীনের ধারণা শিক্ষা দেয়। আল্লাহ্‌পাকের খেলাফত দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করার শিক্ষা দেয়। তরিকত শিক্ষার প্রচলিত ধারণা, পীরি-মুরিদির প্রচলিত প্রকৃতির মূলোচ্ছেদ করে হক দ্বীনের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য, শরীয়তের রূহানিয়াত এবং সুরতের পূর্ণ সম্পদ অর্জনের জন্য এই সিলসিলায়ে নকশ্‌বন্দিয়ার প্রক্রিয়াই সকল স্তরের মানুষের জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য এবং উপযুক্ত প্রক্রিয়া। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি (রহঃ) এই তরিকার আরো উৎকর্ষ সাধন করেছেন বলে এই তরিকাই পরবর্তী সময়ে মোজাদ্দেদিয়া তরিকা নামে অভিহিত হয়ে আসছে। এই তরিকারই প্রধান প্রবাহের নাম তরিকায়ে খাস মোজাদ্দেদিয়া।

হজরত হাকিম আবদুল হাকিম (রহঃ) এই খাস মোজাদ্দেদিয়া তরিকায় তালিম প্রাপ্ত হয়ে মোজাহেদায় লিপ্ত হলেন। একই সঙ্গে তিনি দুনিয়ার রিজিক তালাশের অসিলা অর্জনের জন্য শিক্ষা করতে থাকলেন আয়ুর্বেদীয় পদ্ধতির চিকিৎসা শাস্ত্র।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতন সন্নিকটে। সারা ভারত জুড়ে শুরু হয়েছে ইনকেলাব। স্বাধীনতার জন্য বিক্ষোভে বিদ্রোহে ফেটে পড়তে চায় সারা ভারতবাসী। সমগ্র ভারতে দ্রুত বিস্তৃত হয়ে পড়ে বিদ্রোহের দাবানল। মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে স্বদেশী আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদ। মুসলমান হিন্দু অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সবাই প্রথমে একই রাজনৈতিক

সংগঠনের মাধ্যমে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো। পরে ভাগ হলো মুসলিম ও হিন্দুদের সংগঠন। অহিংসার পথে গেলো এক দল। কেউ হলো সন্ত্রাসবাদী। বুলন্দ আওয়াজ উঠলো সারা ভারতের শহরে জনপদে। কখনো 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' কখনো 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো সমগ্র ভারতের আকাশ বাতাস।

হজরত হাকিম আবদুল হাকিমের আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শিক্ষা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ভাবলেন তিনি, আয় রোজগারের দিকে খেয়াল করা দরকার। পিতা ও পীর হজরত আমিনউদ্দিনের বয়স বেড়েছে। সমস্ত শরীরে বার্ধক্যের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। এবার এ সংসারের হাল তাঁরই ধরা দরকার। সংসারের চিন্তা ভাবনা থেকে এবার মুক্তি দেওয়া দরকার পিতাকে। প্রিয়তম মোর্শেদকে।

এ সময় মহকুমা শহর বশিরহাটে আবদুল হাকিম খুললেন তাঁর দাওয়াখানা। এই দাওয়াখানাতেই তিনি বসতে শুরু করলেন নিয়মিত। রোগীপত্র আসে। আল্লাহ্পাক আয় রোজগারও দেন কিছু কিছু।

মন্দ ভালোয় কেটে যাচ্ছিলো দিন। কিন্তু হঠাৎ করেই সারা পরিবারে একদিন নেমে এলো শোকের ছায়া। হজরত আবদুল হাকিমের প্রিয়তমা পত্নী নাবালক দুই সন্তান সহ সবাইকে শোকাকুল করে পাড়ি দিলেন পরপারে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে উঠলেন হজরত আবদুল হাকিম। কিছুদিন পর হজরত আমিনউদ্দিন অনেক ভেবে চিন্তে পুত্রকে বিবাহ দিলেন আবার। ভাবলেন সংসারে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। তাঁর নিজের জন্য আর চিন্তা কি? কয়দিনই বা আর তিনি আছেন সংসারে।

হজরত আমিনউদ্দিন ভাবেন, শেষ সফরের সামান বাঁধতে হবে এবার। ইদানিং মন কেমন কেমন করে। মাশুকের দরবার থেকে নিঃশব্দ আহবান এসে বুককে উতলা করে মাঝে মাঝে। সে এক আনন্দ বেদনা মিশ্রিত বিচিত্র অনুভূতি।

হঠাৎ তিনি একদিন শুনতে পেলেন, হজরত হাজী রিয়াসত আলী খান ইন্তেকাল করেছেন। সংবাদ শুনেই শরাহত বিহঙ্গের মতো অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। প্রিয় মোর্শেদও চলে গেলেন। জীবনে কোনোদিনই দেখা হবে না আর। এই কালুতলা গ্রামে কোনোদিনই আর ফুটে উঠবে না তাঁর নূরানী চেহারার বেহেশতী রশ্মি। সব শেষ হয়ে গেলো।

এভাবেই সব শেষ হয়। সিলসিলার বজুর্গবৃন্দ সমন্বয়ে মুখরিত মহফিল এভাবেই শেষ হয়ে গেছে। যবনিকার এপারে পড়ে আছি আমরা অসহায় পাপিষ্ঠজন। আর যবনিকার ওপারে, মৃত্যুর কালো নেকাবের আড়ালে ঐ জগতে বসেছে ইশকের মুখরিত মহফিল। যেখানে রসূলেপাক (সঃ) আছেন তাঁর অন্যান্য ভ্রাতৃবৃন্দ আছেন। তাঁর সহচরবৃন্দ, বংশধরগণ আছেন। মুজতাহিদ ইমাম, আউলিয়া কেরাম আছেন। এই সিলসিলার মহামর্যাদাসম্পন্ন পীরানে কেরামগণ আছেন। প্রিয় পীর, প্রাণপ্রিয় মোর্শেদও এবার শরীক হলেন তাঁদের পবিত্র মহফিলে, যেখানে অনন্তকাল ধরে জারী থাকে

সাল্‌সাবিলের জ্যোতির্ময় প্রবাহ, যেখানে দীদারের অনির্বাণ দীপশিখায় আশেকের দল চিরন্তন সুখ পায়, সেইখানেই চলে গিয়েছেন প্রিয়তম মোর্শেদ। কোনোদিনই আর শুনতে পাওয়া যাবে না তাঁর উর্দু জবানের ডাক, আমিনউদ্দিন—আমিনউদ্দিন'।

হজরত হাজী সাহেবের ইন্তেকালের পর থেকে আরো বেশী আনমনা হয়ে যেতে থাকলেন হজরত আমিনউদ্দিন। শেষ সফরের জন্য তিনি সদা প্রস্তুত হয়ে থাকেন। এই বুঝি ডাক আসে। এই বুঝি ডাক আসে।

আবদুল হাকিমের জন্য চিন্তা হয়। তাঁর রূহানী মঞ্জিল অতিক্রমণের কাজ এখনো বাকী রয়ে গেলো। মনে হয় পূর্ণতার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাঁকে পৌঁছে দেয়ার সময় সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। তার আগেই এসে পড়বে মাশুকের ডাক।

তিনি একদিন নির্জন স্থানে ডেকে নিলেন আবদুল হাকিমকে। খাস্ তাওয়াজ্জোহ্ দিলেন পুত্রের প্রতি। সংক্ষিপ্তভাবে তাঁকে প্রদান করলেন সমস্ত রূহানী মাকামতের নেসবত। বিস্তারিত কামালিয়ত অর্জনের জন্য সময় প্রয়োজন। আর কিছুদিন জীবিত থাকলে ভালো হতো। কিন্তু তা হবার নয়। সময় সংক্ষিপ্ত।

হজরত আমিনউদ্দিন প্রিয় ফরজন্দ আবদুল হাকিমকে অসিয়ত করলেন। শর্তসাপেক্ষে মৌখিকভাবে খেলাফত প্রদান করলেন তাঁকে। পূর্ণতা হাসেলের জন্য দীর্ঘদিন ধরে মোজাহেদায় লিপ্ত থাকতে হবে। তারপর তাঁকে জানিয়ে দিলেন কিছু কিছু গোপন আলামতের কথা। বললেন, 'এসব আলামত যখন উপলব্ধি করতে পারবে, তখন বুঝবে তোমাকে কাজ শুরু করতে হবে। এই মহামূল্যবান সিলসিলার নূরানিয়াত বিতরণের কাজ তখনই শুরু করতে হবে তোমাকে।'

কিছুদিন পরেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন হজরত আমিনউদ্দিন। অসুখ ক্রমে বাড়তে লাগলো। শয্যাশায়ী হলেন তিনি। সারা শরীরে শেষ বিমারীর পাণ্ডুরতা। কিন্তু মুখাবয়ব জান্নাতি নূরের আভায় দীপ্তিমান। আর বেশী বাকি নেই। প্রিয়তম মোর্শেদের সঙ্গে মিলিত হবার সময় হয়েছে এবার। মাশুকের সেই মুখরিত দরবারের নেশা হজরত আমিনউদ্দিনকে পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করে ফেললো। তিনিও এক মোবারক মুহূর্তে চলে গেলেন মাশুকের মূল মজলিশে।

মোর্শেদের মৃত্যুতে বিহবল হয়ে পড়লেন হজরত আবদুল হাকিম। হায় পিতা! হায় মোর্শেদ! সারা জীবন কেটে গেলো হেলায় ফেলায়। বাউণ্ডেলের মতো ঘুরে বেড়ালাম পথে ঘাটে পাহাড়ে অরণ্যানীতে। আল্লাহ্‌পাকের মেহেরবানিতে যখন চিনলাম তোমাকে— যখন মনে করলাম তোমার আল্লাহ্-প্রেমে দগ্ধমান বুকে বুক লাগিয়ে ইশকের অনলে জ্বলে পুড়ে কাটিয়ে দেবো জীবনের বাকী সময়টুকু— তখনই তোমার যাবার সময় হলো। তখনই তুমি চলে গেলে চিরতরে।

ভাবতে লাগলেন আবদুল হাকিম। কি করবেন তিনি। কোথায় যাবেন এবার। সারা ভারত জুড়ে শুরু হয়ে গেছে মার মার কাট কাট অবস্থা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষবাষ্পে কলুষিত হয়ে গেছে সারা দেশ। কি করবেন এবার। কোথায় যাবেন তিনি।

পিতৃবিয়োগের শোক সামলে নিতে না নিতেই চলে গেলেন মা। মা। জন্মদাত্রী মা। তোমার বুকের জীবনী শক্তি দিয়ে গড়ে উঠেছে আমার এই সুগঠিত শরীর। তোমার কদমের নীচে থেকে যখন আমি হাসেল করতে চেয়েছিলাম আমার চির সুখময় বেহেশত, তখনই চলে গেলে তুমি। নবীজি (সঃ) বলেছেন, পিতামাতার মুখের দিকে মহব্বত সহকারে তাকালে এক মকবুল হজের ছওয়াব লাভ হয়। মা। কাবা জেয়ারতের সামান আমার নেই। 'লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক' বলে বায়তুল্লাহ্ শরীফের শোভায় তাপিত নয়ন জুড়ানোর সুযোগ আমার নেই। তাই তোমার পবিত্র বদন দর্শনে আমি হাসেল করতে চেয়েছিলাম কাবা জেয়ারতের শান্তি। কিন্তু সে সুযোগও চিরতরে হাতছাড়া হয়ে গেলো।

দেশের অবস্থা ধীরে ধীরে কেমন যেনো হয়ে যাচ্ছে। মুসলমান হিন্দু ক্রমে ক্রমে হিংস্র হয়ে যাচ্ছে। পরস্পর পরস্পরকে পেলেই নিশ্চিহ্ন করে দেবার মতলবে সবাই যেনো হয়ে গিয়েছে উন্মাদপ্রায়।

কলকাতায় হয়েছে বিরাট দাঙ্গা। মুসলমান হিন্দু উভয় পক্ষে প্রাণ দিয়েছে শত শত মানুষ। তাঁরই প্রতিক্রিয়া এসব গ্রাম এলাকাতেও এসে পৌঁছেছে।

কালুতলার আশে পাশে হিন্দুদেরই প্রভাব প্রতিপত্তি ছিলো বেশী। মুসলমান জনসাধারণের প্রতি তাদের বিদ্বেষভাব বেড়ে চললো দিন দিন।

আবদুল হাকিম ভাবতে লাগলেন, এ অবস্থায় কতোদিন আর এ গাঁয়ে থাকা উচিত। এখানে পিতৃ পুরুষের ভিটে বাড়ী, এখানে জন্মভূমি, জন্মস্থান। এখানে মোর্শেদের রওজা শরীফ। এ গাঁয়ের গাছগাছালী পুষ্করিণীর ঘাট, এ গাঁয়ের রাত-জাগা পাখি, এ গাঁয়ের মাটির গন্ধ— সব কিছুইতো নিজের জীবনের মতো আপন।

কিন্তু তা কি আর হবার উপায় আছে। শাহজানপুরের বুজর্গের কদমের স্পর্শে পবিত্র এই গ্রাম, প্রিয়তম মোর্শেদের আজীবন বাসভূমি, নীরব নূরের এই ঝর্ণাধারার পাশে অবস্থান করা আর কি সম্ভব এখন।

নতুন কোথায় যেতে হবে মনে হয়। অন্য কোথাও এবার বাঁধতে হবে ডেরা। হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোথায় অন্য কোনোখানে।

কিন্তু কোথায় যাবেন তিনি। জানা নেই পৃথিবীর কোন্ মৃত্তিকাখণ্ডে এবার বাঁধতে হবে নতুন সংসার। শুরু করতে হবে নতুন জীবন।

দেশ ভাগ হয়ে গেলো।

বৃটিশ শাসকরা ফিরে গেলো নিজ দেশে। কিন্তু তাদের চিরাচরিত কুট কৌশলের চিহ্ন রেখে গেলো এদেশে। ভারতের পশ্চিম অঞ্চলের কিছু অংশ এবং

পূর্ব অঞ্চলের একটা ক্ষুদ্র অংশ মিলে উৎপত্তি হলো নতুন এক রাষ্ট্রের। এ রাষ্ট্রের নাম পাকিস্তান। মুসলিম রাষ্ট্র।

ভাবতেও আশ্চর্য বোধ হয় এই বিরাট উপমহাদেশ ভারতে এক সময় নিরঙ্কুশ প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলো মুসলমানদের। বুৎপরোস্তির দেশে হাজার বছর ধরে হাজার হাজার আউলিয়া এসেছিলেন সত্য দ্বীন প্রসারের জন্য। ছড়িয়ে পড়েছিলেন তাঁরা সমগ্র হিন্দুস্তানের কোণায় কোণায়। কেউ আরব থেকে, কেউ মিসর থেকে, কেউ বাগদাদ থেকে, কেউ বলখ, বদখশান, তুস, খোরাসান, হেরাত, গজনী, ইরান থেকে। আজব প্রেমিক ছিলেন তাঁরা। দুর্বার ছিলো তাঁদের রূহানী শক্তির প্রচণ্ডতা। না তাঁরা এ দেশবাসীর ভাষা বুঝতেন, না এদেশবাসী বুঝতো তাঁদের ভাষা। কিন্তু ক্ষতি কি তাতে। তাঁদের হৃদয়ে তো ছিলো মানব প্রেমের তেজদীপ্ত সূর্যরশ্মী। আসমানের মতো উদারতা ছিলো তাঁদের দিলে। ইমানের দীপ্তিতে পরিপূর্ণ তাঁদের অন্তর্জগতের তীব্র জ্যোতি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলো দেব-দেবীর উপাসক এদেশবাসীর অংশীবাদের তমাসায় আচ্ছন্ন হৃদয়ের জড়তা। ধীরে ধীরে এদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হলো তাঁদের কোরবানীর ফসল। স্থাপিত হলো ইমানের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল এক নতুন কওমের। ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের।

সর্বপ্রথম আল্লাহ্পাকের যে আজব আশেক এক বিরাট মুসলিম কাফেলায় নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন, তিনি হচ্ছেন সুলতানুল হিন্দ হজরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্তি (রহঃ)। তিনি ও তাঁর সহচরবৃন্দের কোরবাণীর ফলে লক্ষ লক্ষ মোমেনের এক বিরাট জামাত মাথা তুলে দাঁড়ালো এই বুৎপরোস্তির দেশে। পরবর্তী সময়ে তাঁরই সিলসিলার বুজুর্গবৃন্দের মধ্যে যাঁরা ইমানের কুওতে সঞ্জীবিত রেখেছিলেন এদেশীয় মুসলমানের হৃদয়ের প্রান্তর তাঁরা হচ্ছেন হজরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী (রঃ)। হজরত ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর (রঃ), হজরত আলাউদ্দিন আলী কালিয়ারী (রঃ) প্রমুখ অগণিত আল্লাহ্পাকের ফকির।

শুধু চিশ্তি বুজুর্গগণই নন, সোহরাওয়ার্দিয়া, কিবরিয়া, কলন্দরিয়া, মাদারিয়া, ফেরদৌসিয়া, শাজালিয়া প্রভৃতি বহু সিলসিলার ফকিরবৃন্দ নিজ নিজ স্থানে আজীবন ধরে লিপ্ত থেকেছেন মানবতার একমাত্র মুক্তি সনদ দ্বীন ইসলামের প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কাজে। নিজ জন্মভূমিতে আর ফিরে যাবার সুযোগ পাননি তাঁরা। এদেশের মাটির সঙ্গেই করেছেন শেষ কোলাকুলি।

এই ফকির সম্প্রদায়ের এক উল্লেখযোগ্য অংশই ছিলেন সংসারত্যাগী। আল্লাহ্ প্রেমের প্রাবল্যের কারণে মত্ততার শিকার ছিলেন তাঁদের অনেকেই। তবুও তাঁরা মুসলমান সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার ব্যাপারে ছিলেন সজাগ।

বিশাল হিন্দুস্তানে যাঁদেরকে আল্লাহ্পাক মনোনীত করেছিলেন তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করবার কাজে— তাঁদের চিন্তা চেতনাই ছিলো সঠিক। তাঁরা প্রথমে মানুষের পাপ-পঙ্কিল অন্তঃকরণে এনেছিলেন ইমানের ফল্গুধারা। তারপর সেই ফল্গুধারার নির্বিরোধ প্রবাহ জারী রাখবার জন্য গ্রহণ করেছিলেন রাজনৈতিক হেফাজতের উপকরণ। তাই হজরত খাজা মঈনউদ্দিন চিশ্তি (রঃ) দাওয়াত দিয়েছিলেন শাহাবুদ্দিন ঘোরীকে এদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য। পরবর্তী সময়ে এদেশের প্রতিটি সুলতানকেই প্রভাবিত করে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন চিশ্তি বুজুর্গগণ। তাঁদেরকে ইসলামের রাজনৈতিক হেফাজতের কাজে ব্যবহার করেছিলেন চিশ্তি মাশায়েখগণ।

বাদশাহ্ আকবরের সময় পর্যন্ত এই অবস্থাই চলে আসছিলো। চলে আসছিলো চিশ্তি বুজুর্গগণের একচ্ছত্র প্রতিপত্তি। তাঁদের রূহানী কুওতে সমৃদ্ধ হয়েই মুসলমান বাদশাহগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ মোশরেক অধ্যুষিত এই দেশে টিকিয়ে রেখেছিলেন নিজেদের রাজত্ব।

এরপর এলেন নকশ্বন্দিয়া তরিকার বিস্ময়কর বুজুর্গ হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ (রঃ)। নীরব ধুমকেতুর মতো মাত্র তিন চার বছর দিল্লীর আসমানে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেলেন তিনি আল্লাহ্পাকের অন্তহীন প্রেমের অদৃশ্য জগতে। কিন্তু সেই স্বল্পকালের ধুমকেতুর প্রচণ্ড আলোকে পথের মূল দিশা চিনে নিতে অসুবিধা হলো না শায়েখ আহমদের (রঃ)। চকমকি পাথরের হঠাৎ জ্বলে ওঠা আলোকে তিনি স্থায়ীভাবে প্রজ্জ্বলিত করলেন নিজের হৃদয়ে। হৃদয়ের এই প্রচণ্ড শক্তিতে ইসলাম বিরোধী শিবিরকে নির্মূল করে দিয়ে হক দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম শুরু করলেন হিন্দুস্তানের সেই ফারূকী ফকির। কিন্তু এবার তিনি বেছে নিলেন অন্য প্রক্রিয়া— অন্য তরিকা। এই তরিকার ভিত্তি ইবাদত বন্দেগীর উপরে নয়। মহব্বতের উপরে এর প্রতিষ্ঠা। মোর্শেদ এবং মুরিদের প্রেম-বন্ধনের ফলে অতি সহজেই মুরিদগণ মোর্শেদের রূহানী শক্তি দ্বারা নিজেকে রঞ্জিত করতে সক্ষম হন। এই তরিকা সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী হজরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) এর তরিকা। তাঁর এবং রসূলপাকের (সঃ) যেরূপ প্রেমবন্ধন ছিলো, সেই ইশকের বন্ধনে মজবুতভাবে পরস্পর পরস্পরকে বেঁধে ফেলে এক আল্লাহ্র ইশকে বিলীন হয়ে যাওয়াই এই তরিকার উদ্দেশ্য। রূহানী শক্তি অর্জনের জন্য বহু বছর ধরে নির্জন বাস করে, বনে জঙ্গলে ইবাদত বন্দেগী করে রূহানী শক্তি সঞ্চয় করার নিয়ম কানুন এই তরিকায় অনুপস্থিত।

দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মোজাদ্দেদ হজরত শায়েখ আহমদ (রঃ) এর আবির্ভাব হয়েছিলো দ্বীনের মধ্যে হাজার বছর ধরে প্রবিষ্ট জুলমত অপসারণ করে সেখানে হেদায়েতের নতুন ঊষার অভ্যুদয় ঘটাবার জন্য। আর যেহেতু পূর্বের জামানার মতো সহজ জীবন যাপন পদ্ধতি ক্রমেই অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিলো দুনিয়া থেকে, তাই যুগ-

যন্ত্রণার এই জটিলতার মধ্যে দীর্ঘ কষ্টসাধ্য আধ্যাত্মিক সাধনার পদ্ধতি পরিহার করে একমাত্র নকশ্‌বন্দিয়া তরিকার সহজ প্রক্রিয়াকেই তিনি সংস্কার-সূচীর অনুকূল বলে মনে করলেন এবং সমাজের সর্বস্তরে এই তরিকার ব্যাপক প্রসার ঘটাবার জন্য গ্রহণ করলেন এক যুগান্তকারী পরিকল্পনা। অবশেষে তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িতও হলো। তাঁরই প্রচেষ্টায় হিন্দুস্তান পেলো জাহাঙ্গীরের মতো তওবাকারী, শাহজাহানের মতো প্রেমিক এবং আওরঙ্গজেবের মতো অলি-আল্লাহ্ বাদশাহ্।

আজ দ্বীনের যে সমস্ত খাদেম দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে আছেন, তাঁদের প্রধান কর্তব্য কর্ম হচ্ছে, দ্বীন ইসলামের প্রাণ প্রবাহ এই সিলসিলার ফয়ুজাতের ধারা থেকে রূহানী কুওত অর্জনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখা। আল্লাহ্ না করুন, কেউ যদি দ্বীনের অভ্যন্তরীণ এই প্রাণশক্তিকে অস্বীকার করে, তাকে অবশ্যই বঞ্চিত ব্যক্তিগণের তালিকাভুক্ত হতে হবে এবং দ্বীনের প্রাণহীন বহিরাবরণ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আর যদি কেউ বর্তমান বিশ্বের কর্মমুখর যন্ত্র সভ্যতার যুগে কঠোর মোজাহেদার শর্তাবলী যুক্ত অন্য যে কোনো তরিকা গ্রহণের মাধ্যমে রূহানী পবিত্রতা অর্জনের চেষ্টা চালান, তবে তাঁদেরও বঞ্চিত হবার সম্ভাবনাই অধিক। তাঁদের তুলনা এমন ব্যক্তির সঙ্গে হতে পারে, যে ব্যক্তি দ্রুতগামী বাহন থাকতেও পদব্রজে দীর্ঘ-পথ অতিক্রম করতে চায়। আর যারা ইসলামে অটল থাকবার দাবী করেও অন্য কোনো মতবাদের মধ্যে যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব খোঁজে বা অন্য যে কোনো মতবাদকে সমাজ বদলের জন্য, তথাকথিত সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহার যোগ্য বলে মনে করে, তারা তো জাহান্নামের পথের পথিক বলে নিজেদেরকে পরিচিত করবার অভিলাষী। নিঃশর্ত তওবা প্রয়োজন তাদের জন্য। চির সুবাসিত, চির অমলিন দ্বীন, ইসলামের মধ্যেই রয়েছে সকল যুগের উদ্ভূত সমস্যাবলী সমাধানের নির্ভুল প্রতিষেধক। ফিরে আসবার পথ উন্মুক্ত সর্বদাই। ফিরে এসো মানবতা। ফিরে এসো।

এই উপমহাদেশে মুসলমানদের উত্থান পতনের ঘটনা পর্যালোচনা করলে সহজেই বুঝতে পারা যায়, বুজুর্গগণের নির্দেশিত পথ যা অবিকল রসূলে মকবুল (সঃ) এর পথ তা থেকে বিচ্যুতিই আমাদের যাবতীয় দুর্দশার কারণ।

পরবর্তী সময়ে মোগল বাদশাহ্গণের ফকির সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতিই ডেকে এনেছে পরাধীন জীবন।

শরীয়ত তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত— এলেম, আমল ও এখলাস। এখলাস অর্জনের জন্য সুফিয়ানে কেরামের তরিকায় দাখেল হতে হয়। এলেম ব্যতিরেকে যেমন আমল ও এখলাস মূল্যহীন, তেমনি আমল ব্যতিরেকে এলেম ও এখলাসেরও কোনো মূল্য থাকে না। আবার এখলাস ব্যতিরেকে কোনো আমল কোনো এলেমই আল্লাহ্পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। এসবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন হজরত

মোজাদ্দেদে আলফে সানি (রঃ)। তিনি বলেছেন, তরিকা গ্রহণ করা ফরজে আইন। আরও বলেছেন, নকশবন্দিয়া সিলসিলা এ জামানার জন্য একমাত্র গ্রহণযোগ্য তরিকা।

একথা নিশ্চিত যে, দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মোজাদ্দেদ, যিনি হজরত রসূলেপাক (সঃ) এর কামালে এত্তেবার রূপরেখা এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যে সমস্ত ব্যাখ্যা বিবৃতি দিয়ে গিয়েছেন এবং তৎসহ রূহানী শক্তি সঞ্চয় করবার জন্য যে তরিকা প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন— পরবর্তী সময়ে ওলামায়ে কেরাম এবং পীর বুজুর্গগণের এক বিরাট অংশ তার সঠিক গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম না করার কারণেই এ উপমহাদেশে মুসলমানগণ তাদের রাজত্ব হারিয়েছে— স্বাধীনতা হারিয়েছে— পথের দিশা হারিয়েছে। দীর্ঘ দুই শত বছর গোলামীর পরও মুসলমানেরা বুঝে উঠতে পারেনি তাঁদের প্রকৃত কর্তব্যকর্ম কি?

তরী যে আজ দিশাহীন। দিক নেই। চিহ্ন নেই। হিন্দুস্তান তো নয়, সমগ্র পৃথিবীই যে সম্মিলিতভাবে সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনের জন্য অলিখিত আঁতাত গঠন করেছে। দল উপদলের কোন্দলে মুসলমান জামাত খণ্ড বিখণ্ড। দুলছে সবাই অবিশ্বাসের দোদুল্যমানতায়। ইমানের অপুষ্টতার শিকার আজ আখেরী জামানার পয়গম্বর (সঃ) এর পেয়ারা উম্মতবৃন্দ। এ অবস্থায় বৃটিশ রাজ এদেশ ছাড়তে বাধ্য হলো বটে, কিন্তু রেখে গেলো সুদূর প্রসারী বিভেদের বীজ। ভৌগলিক সীমা বেঁধে দেয়া হলো। ভাগ হয়ে গেলো হিন্দুস্তান। সেই হিন্দুস্তান যেখানে ছিলো সাড়ে সাত শত বছর ধরে মুসলমানদের একচ্ছত্র শাসন।

দেশ ভাগের পরও চললো সারা দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িকতার নোংরা চর্চা। জীবনের নিরাপত্তা নেই। ইজ্জত আব্রুর নিরাপত্তা নেই। বিস্তৃত হিন্দুস্তানের বিভিন্ন স্থানের বহু মুসলমান হিজরত করলেন নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে। অন্য সকলের মতো আবদুল হাকিমও একদিন জানলেন, কালুতলা পাকিস্তানে পড়েনি। শত শত মুসলিম জনপদের মতো হাজার হাজার মুসলমান গ্রামের মতো কালুতলাও পড়েছে ভারতে। গোটা চব্বিশ পরগনা জেলাই ভারতে পড়েছে। মহকুমা বারাসাত ও বশিরহাটও তাই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ভারতের মানচিত্রে। সেই মানচিত্রে উল্লেখ করা হলো বশিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার। লোনা নদী ইছামতির ধার ঘেঁষে বেড়ে ওঠা এই থানার ভিতরেই পড়েছে কালুতলা। কালুতলার শরীর ছুঁয়ে বয়ে চলেছে ইছামতির লবণাক্ত স্রোত। অতি অখ্যাত অতি ক্ষুদ্র এই গ্রামের উল্লেখ মানচিত্রে থাকবার কথা নয়। তবুও আবদুল হাকিম জানলেন কালুতলা পড়েছে হিন্দুস্তানে। পাশের খুলনা জেলা পড়েছে পাকিস্তানে। খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমা শহর থেকে মাইল পাঁচেক দূরে আলীপুর। আলীপুর পড়েছে পাকিস্তানে। সেই আলীপুর যেখানে দ্বীন প্রসারের কাজে মাসের পর মাস সপরিবারে কাটিয়েছেন উত্তর প্রদেশের সেই দীর্ঘদেহী বুজুর্গ হজরত রিয়াসত আলী খান শাহজানপুরী (রঃ)। তিনি আজ বেঁচে থাকলে দেখতে পেতেন, আলীপুর যাওয়া আর সহজ নয় এখন। আলীপুর যেতে গেলে এখন অতিক্রম করতে হবে রাষ্ট্রীয় সীমারেখা।

অন্য সকলের মতো আবদুল হাকিমও চিন্তিত হলেন। কি করে আর বাস করা সম্ভব মুশরিক প্রভাবান্বিত এই দেশে। আশে পাশের গ্রাম থেকে কেউ কেউ চলে যাচ্ছে পাকিস্তানে। বশিরহাট শহর থেকে চলে গেছে অনেকেই। এ গাঁয়েরও কেউ কেউ যাবার জন্য প্রস্তুত। যাওয়াই উচিত।

হিজরতের জন্য প্রস্তুত হলেন হজরত হাকিম আবদুল হাকিম। হিজরতের স্থান নির্দিষ্ট করলেন সাতক্ষীরা। সাতক্ষীরা শহর। সেখানে নাকি এদিককার পরিচিত অনেকেই গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে আত্মীয় স্বজনও আছেন কিছু কিছু। একটা কিছু উপায় বের করতে হবে সেখানে গিয়ে। আল্লাহ্‌র দুনিয়া ছোট নয়। তাছাড়া মুসলমানতো নির্দিষ্ট কোনো দেশের নয়। সমগ্র বিশ্বই তাঁদের। যেখানে ইমানের নিরাপত্তা আছে, জীবনের নিরাপত্তা আছে— দারুল আমান আছে, সেখানে হিজরত করবার তাগিদ তাই দেয়া হয়েছে মুসলমানদেরকে।

একদিন তিনি প্রস্তুত হলেন পাকিস্তান চলে যাবার জন্য। অর্থ সম্পদ বেশী কিছু নেই। গুণে দেখলেন সামান্য কিছু টাকা। সঙ্গে নিলেন প্রয়োজনীয় কাপড় চোপড়ের একটা পুঁটলি। এই অবস্থায় কালুতলা ছেড়ে পাকিস্তানের দিকে পা বাড়ালেন তিনি। বর্ডার বেশী দূরে নয়। কিছুদূর গেলে একটা নদী পড়ে। সেই ইছামতি নদী। নোনা ঘোলা পানি ইছামতির। সমুদ্রের কাছাকাছি নদী। তাই প্রতিদিন জোয়ার ভাটা হয় ইছামতিতে। এখান থেকে কিছুদূর গিয়ে ইছামতি পড়েছে সমুদ্র মোহনায়।

হজরত আবদুল হাকিম নদীর দিকে রওয়ানা হলেন। পিছনে পড়ে রইলো কালুতলা গ্রাম— ছায়া ঢাকা পাখি ডাকা গাছ গাছালীর আড়ালে লুকিয়ে থাকা উঁচু ভিটির ওপর সর্দার বাড়ীর ক'খানা ঘর। বিদায়। জন্মভূমি আমার। কালুতলা আমার। বিদায়।

বিদায় চিরদিনই বেদনাদায়ক। অশ্রু ঝরা। হৃদয় বিদারক। তবুও জীবন তো এরকমই। এঘাট থেকে ওঘাটে। অন্য কোথা— অন্য কোনোখানে।

পথে দেখা হলো ছোট বেলাকার এক বন্ধুর সঙ্গে। বন্ধুটি হিন্দু। বরাবর তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ভালোই আবদুল হাকিমের। অন্য হিন্দুদের মতো নয় সে। অন্ততঃ আবদুল হাকিমের প্রতি বিদ্বেষ ভাব নেই তার।

হিন্দু বন্ধুটি 'কোথায় যাচ্ছো' ধরনের প্রশ্ন করলে— তাকে বিশ্বাস করা যায় সেই ধারণায় আবদুল হাকিম বলেই ফেললেন আসল কথাটি। বন্ধুটি দেশ ছেড়ে চলে যাবে বলে ব্যথিত হলো। তারপর এগিয়ে দেবার নাম করে নদীর ঘাট পর্যন্ত সাথে সাথে গেলো।

ঘাটে মাঝি নেই। নৌকা আছে। কি আর করা। মাঝির অপেক্ষা করতেই হয়। হঠাৎ দেখা গেলো হিন্দু বন্ধুটির চেহারা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। সে গম্ভীর স্বরে ভয় দেখিয়ে বললো, 'যাচ্ছিস তো যা। কিছু বলবো না। কিন্তু সঙ্গে যা নিয়েছিস সব দিয়ে যেতে হবে আমাকে।'

তার কথা শুনে আবদুল হাকিমের রক্ত উঠলো টগবগিয়ে। বলে কি বদমায়েশ! আবদুল হাকিম কি কখনো অন্যায়ের নিকটে নত হয়।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটির ঘাড় ধরে ফেললেন আবদুল হাকিম। ঘাড় ধরে এক ধাক্কায় তাকে ধরাশায়ী করে ফেললেন। তারপর নদী পার হয়ে চলে গেলেন ওপারে। সেখান থেকে সাতক্ষীরা শহর বেশী দূরে নয়। আট দশ মাইল হতে পারে।

নতুন দেশ।

বিশ্বের মানচিত্র বদল হলো। বিশ্বের মানচিত্রে মাথা তুলে দাঁড়ালো নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান। পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে তখনও নতুন রাষ্ট্রের উন্মাদনা স্তিমিত হয়নি। এমনি সময়ে হজরত হাকিম আবদুল হাকিম এলেন নতুন দেশে। সাতক্ষীরায়।

শিশু কিশোরদের কণ্ঠে তখনো নতুন রাষ্ট্রের গান, 'পেয়ারা পাকিস্তান আমাদের পেয়ারা পাকিস্তান।' 'তৌহিদের শান্ত্রী দল সামনে চল সামনে চল।'

জনসাধারণের মনে তখনো স্বপ্নের মতো আমেজ। এবার হয়তো আসবে শান্তি, সুখ। মুসলমান সম্প্রদায় আবার হয়তো দাঁড়াতে পারবে দুনিয়ায় মাথা উঁচু করে।

হজরত আবদুল হাকিম ফকির মানুষ। তাঁর চিন্তা চেতনা অন্য রকম। ভৌগলিক স্বাধীনতায় মানুষের প্রকৃত মুক্তি আসে না তা তিনি ভালো করে জানেন। যিনি স্রষ্টা যাঁর তরফ থেকে শান্তি আসে, তাঁর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন না করে শান্তি সুখের আশা করা বৃথা।

মানুষের খালেক, মালেক, রাজ্জাক, আল্লাহ্পাকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কাজ করা দরকার। কিন্তু সে রকম শক্তি তো এখনো তাঁর মধ্যে আসেনি। একটা প্রচণ্ড শক্তি মাঝে মাঝে অন্তরকে আলোড়িত করে। কিন্তু প্রিয় মোর্শেদের অসিয়ত তো অন্যরকম। তিনি যে সমস্ত আলামত বর্ণনা করেছেন, তা তো এখনো প্রকাশিত হয়নি। মনে হয় দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হবে এর জন্য। কতদিন কে জানে।

একটা ছোট্ট খাল সাতক্ষীরা শহরের মাঝখান দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে বয়ে গিয়েছে। ছোট্ট খাল। তবুও এখানে জোয়ার আসে। ভাটা আসে। নদীর সঙ্গে যোগাযোগ আছে এর। সমুদ্রের নিকটবর্তী এলাকার অন্যান্য নদীগুলোর মতো সেই

নদীতে জোয়ার এলে খালেও ভেসে আসে জোয়ারের পানি। কানায় কানায় ভরে যায় ছোট্ট খাল। ভাটির সময় পানি থাকে সামান্য।

এই খালের ধারে ধারে দোকান পাট গড়ে উঠেছে অনেক। বড় ব্রীজের পাশে— দক্ষিণ প্রান্তে বাজার এলাকা। উত্তর দিকেও খালের ধারে সারি সারি দোকান।

উত্তর দিকে খালের পাশে একটা ফাঁকা জায়গায় একখণ্ড জমি সংগ্রহ করলেন আবদুল হাকিম। সেখানে একটা ঘর তুললেন। ঔষধপত্র রাখবার জন্য পুরাতন আলমারী যোগাড় করলেন। সাইনবোর্ড টাঙ্গানো হলো দোকানে, 'হাকিমি দাওয়াখানা, সাতক্ষীরা।' এই দোকানেই আবদুল হাকিম শুরু করলেন তাঁর হাকিমি পেশা।

সাম্প্রদায়িক উত্তপ্ত অবস্থা কিছুটা শীতল হয়ে এলে বশির হাট শহর হয়ে নৌকা যোগে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে এলেন এপারে। বাড়ী-ঘর নেই বলে কিছুদিন তাঁদেরকে রাখলেন তাঁর শ্বশুর বাড়ীতে।

ক্রমে ক্রমে শহরের মানুষের কাছে পরিচিত হয়ে উঠলেন তিনি। সবাই তাঁকে ডাকতে শুরু করলো হেকিম সাহেব বলে। সিলসিলায়ে মোজাদ্দেদিয়ার নূরানী আভা তাঁর সারা অবয়বে ফুটে থাকে। লাল আগুনের মতো মুখের রং। গৌরবর্ণ সুঠাম শরীর। চলনে বলনে ঝলক দিয়ে ওঠে পৌরষ। যেনো অপরাজেয় এক সিপাহশালার। শহরের লোকজন তাঁকে নিজেদের অজান্তেই ভয় করেন— শ্রদ্ধাও করেন।

কিছুদিন পর তিনি বাড়ী করবার জন্য চারবিঘা জমির একটা ভিটেবাড়ী কিনলেন। প্রধান সড়কের পূর্বদিকের সে এলাকার নাম কাটিয়া। এখানকার লোকে বলে 'কেটে'।

জায়গাটা নিরিবিলি খুব। শহরের পাশেই। তবুও গ্রামের মতো নির্জনতা এখানে। আবদুল হাকিমের জায়গাটা পছন্দ হয় খুব। নিবিড় গাছ গাছালীতে ভরা পুরো এলাকাটা। ঠিক কালুতলার মতো।

নতুন কোনো ভিটায় কালুতলার তাঁর নিজেদের বাড়ীর মতোই ছোট বাড়ী তৈরী করলেন তিনি। উঁচু ভিত দিলেন প্রায় মানষু সমান। তার উপর দু'খানা মাত্র ঘর। সামনের দিকে সরু বারান্দা। বারান্দার নিচে সিঁড়ি। ভিতরের দিকে রান্নাঘর। রান্নাঘরের পিছনে ছোট্ট পুকুর। পুকুরে গোসল করা খুবই পছন্দ তাঁর। বাড়ীর সামনে তৈরী করলেন ওষুধ তৈরীর জন্য একটা ঘর। নতুন বাড়ী। ছোট্ট কুটির। বেড়ার উপরে মাটির আস্তরণ লাগানো। উপরে গোলপাতার ছাউনি। ফকিরের আবাস। জৌলুসহীন কুটির। কিন্তু এ কুটিরে সারক্ষণ প্রবাহিত হতে থাকে নেসবতে সিদ্দিকীর অনন্ত নূরের নহর।

ফুল, গাছ গাছালী তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। বাড়ীর সামনে গেটের কাছে লাগালেন দুটো গোলাপ চারা। একটা টকটকে লাল আর একটা শাদা। গেটের ধারে কামিনী। পাশে হাস্নাহেনা। বারান্দায় উঠবার সিঁড়ির দু'ধারে লবঙ্গলতিকা আরো নানান জাতের ফুল।

এর পরে সারা ভিটায় লাগালেন নানা জাতের ওষুধের গাছ। দারুচিনি, তেজপাতা, সফেদা, সুপারী, লবঙ্গ বৃক্ষ। ভিটির সীমানায় সারিবদ্ধভাবে লাগালেন নারকেল গাছ।

এখানকার মাটি উর্বরা। তার উপর তাঁর হাতের ছোঁয়ায় চারাগুলোর তেজ যেনো বেড়ে ওঠে কয়েকগুণ। অতি দ্রুত বেড়ে উঠে গাছগুলো। লতায় পাতায় গাছ গাছালির ভীড়ে যেনো আবার নতুন দেশে নতুন কালুতলা জেগে উঠে।

সংসার ধীরে ধীরে বড় হয়ে যায়। তৃতীয়বার বিবাহের পর সন্তান সন্ততির সংখ্যা বাড়তে থাকে ক্রমশঃ। দাওয়াখানায় রুগী দেখা ছাড়াও বাড়তি রোজগারের চিন্তা করেন তিনি। বিভিন্ন রকম ফলের ও ফুলের গাছের কলম লাগাতে শুরু করেন। এতে আরও বাড়তি দু'পয়সা রোজগার হতে থাকে। তাঁর হাতের তৈরী চারা বেড়েও ওঠে তাড়াতাড়ি। বিক্রিও হয় বেশ।

সংসার চলে যায় কোনোরকমে। জীর্ণ কুটিরের মাঝে সুখে দুঃখে কেটে যায় হজরতের সাংসারিক জীবন। আড়ম্বরহীন সংসার। কিন্তু প্রাণের প্রাচুর্যে ভরপুর।

বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় ঘোর সংসারী মানুষ তিনি। ওষুধ তৈরী করা, দাওয়াখানায় বসা, কলম লাগানো, কামলাদের সঙ্গে পরিশ্রম করা, বাজার ঘাট করা, সব কাজেই তিনি পটু। এমনকি রান্নার কাজেও। কখনো তাঁর বিবি সাহেবার অসুবিধা হলে নিজ হাতেই সংসারের রান্না বান্না করতে হয় তাঁকে।

কিন্তু এরই মধ্য দিয়ে চলে তাঁর নীরব সাধনা। রহস্যময় মোজাহেদা। প্রতিটি মুহূর্তই তাঁর অন্তর্জগতকে তিনি নিয়োজিত রাখেন আল্লাহ্পাকের অনন্ত নূরের রাজ্য থেকে নূর আহরণের কাজে।

গভীর রাতে উঠে পড়েন একাকী। নিশুতি রাতের নীরবতায় এক হয়ে মিশে গিয়ে লিপ্ত হন মোরাকাবায়। কখনো বাইরের বারান্দায় এসে বসেন। কখনো বারান্দার সামনে পায়চারী করেন। কখনো তাঁর তিন ব্যাটারী টর্চলাইটটা নিয়ে বাগানের দিকে যান। ঘন গাছ গাছালীর ফাঁকে ফাঁকে হাঁটতে থাকেন। কখনো দাঁড়িয়ে থাকেন অনেকক্ষণ। আবার হাঁটতে থাকেন। এসময় তাঁর চেহারার রং বদলে যায়। এক রহস্যময় নূরের মনোমুগ্ধকর আভায় দীপ্তিমান থাকে তাঁর সমগ্র মুখাবয়ব। গভীর নিশীথের এই নিঃসঙ্গ পদচারণার কারণ কি? কি রহস্য আছে এর মধ্যে। বোঝা যায় না। কোন্ নেশায় তিনি রাত্রির নীরবতায় গাছ গাছালীর পাশাপাশি গাছের মতোই নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকেন। বারান্দায় বসে থাকেন বহুক্ষণ ধরে। বোঝা যায় না।

বুকের ভিতরে কি একটা যেনো মোচড় দিয়ে ওঠে বার বার। বুকের ভিতরে কি যেনো এক প্রচণ্ড শক্তির মহড়া চলছে। সে শক্তি প্রকাশিত হতে চায়। সমস্ত শরীর জুড়ে জারী হয়ে যায় তাঁর প্রতিক্রিয়া। সে শক্তি, কিসের শক্তি। সেকি প্রেম, সেকি জ্ঞান, না কি শুধুই যন্ত্রণা। তুফানের মতো, ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসের মতো সে শক্তি ধ্বংস

করে দিতে চায় লোকালয়, জনপদ সবকিছু। মোরাকাবার মধ্যে নজরে আসে তীব্র দ্যুতিময় তলোয়ার— সাইফুল্লাহ্। এলহাম হয়, 'নাও।' কিন্তু হাত বাড়ান না তিনি সেদিকে। অন্তর কেমন করে ওঠে। বুকে ওঠে শিহরণ। দু'হাত তুলে আল্লাহ্পাকের দরবারে ফরিয়াদ করেন তিনি, দয়াময় প্রভু— আমি তলোয়ার চাইনা— চাই প্রেম। তোমার সৃষ্টিকে ভালবাসতে চাই। ভালবেসে আমার হৃদয়ের অনন্ত পিপাসা মেটাতে চাই। তোমার বান্দাগণকে আমি কতল করতে চাই না। প্রকৃত জীবনের ঠিকানা দিতে চাই। প্রেমের পাথারে ডোবাতে চাই। ভাসাতে চাই। নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাই।

দিন দিন ইশকের উন্মাদনা বেড়েই চলে। মানুষের অপরাধ প্রবণতা দেখতে পেলে অন্তরে গোস্বা আসে না তাঁর। মুখে ভর্ৎসনা আসে না। মনে হয় আহা, অবুঝ, নাদান। বুঝতে পারেনি। বুঝিয়ে দিলে ঠিক হয়ে যাবে সব। ভালোবাসা পায়নি বলেই তো এরকম হয়েছে। বাপ মা ছাড়া ছেলে পুলেরা যেমন হয়।

এভাবেই কেটে যায় দিন। বছরের পর বছর পেরিয়ে যায়। সেই কালুতলার মতো এই কুটিরের উপরেও নামে বরষার অবিশ্রান্ত বারিধারা। ঘন গাছ গাছালির মাঝে শোনা যায় পাখির ডাক। বসন্তের উদাস হাওয়া দোল দিয়ে যায় এই মায়াবী কুঞ্জবনে। মওসুম বদল হয়। বাগানে ফুল ফোটে। এক এক মওসুমে এক এক রকম। এক এক মওসুমে এক এক রকম রূপ খোলে এ ক্ষুদ্র বনরাজি।

এভাবেই কেটে যায় পনেরো ষোল বছর। আশ্চর্য। কোথা দিয়ে সময় যায়। এই সুদীর্ঘ সময় বয়ে গেলো ঘোর লাগা বর্ষণের মতো। পৃথিবী কতো এগিয়ে গিয়েছে এতদিনে। দেশেও হয়েছে কতোরকম পরিবর্তন। কাটিয়ায় তাঁর বাড়ীর আশে পাশের ভিটিতেও দু'চারটা করে নতুন বাড়ী হয়েছে।

মনে হয় সেই সমস্ত আলামত সম্প্রতি প্রকাশিত হতে শুরু করেছে, পীর মোর্শেদ যা কিছু এরশাদ করেছিলেন। তাইতো। সব যেনো মিলে যাচ্ছে হুবহু। হজরত আবদুল হাকিম বুঝতে পারলেন পর্বত প্রমাণ এক বোঝা ধীরে ধীরে মজবুতভাবে চেপে বসছে তাঁর ঘাড়ে।

আর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করবার কারণ নেই। প্রিয় মোর্শেদ যা কিছু অসিয়ত করেছিলেন— যে সময় আলামত প্রকাশিত হবে বলেছিলেন, একে একে তার সমস্ত কিছুই প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

এবার কাজ শুরু করতে হবে। নূর বিতরণের কাজ। প্রেম বিতরণের কাজ। মানুষের কলুষ দিলের অন্ধকারে আল্লাহ্ প্রেমের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করবার কাজ।

ভাবতে থাকেন হজরত হাকিম আবদুল হাকিম (রহঃ)। কিভাবে কাজ শুরু করা যায়। জাহেরী এলেমে বুৎপত্তি নেই। ওয়াজ নসিহত বক্তৃতা মুখে আসে না। অথচ আল্লাহ্পাকের কি ইচ্ছা— সাধারণ ছাপোষা সংসারী এক মানুষকে, দরিদ্র অনুন্নত দেশের মফস্বল শহরের একজন হাকিমকে দেয়া হয়েছে শ্রেষ্ঠতম সিলসিলার প্রচার প্রসারের দায়িত্ব। কিন্তু আল্লাহ্পাকের আইন তো মানুষের পছন্দ অপছন্দের উপরে নির্ভর করে চলে না। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। তিনি যা করেন সে বিষয়ে প্রশ্ন করবার কেউ নেই। তিনি যাকে খুশি তাকেই নিয়োজিত করেন দ্বীনের খাদেম হিসাবে। তিনি যাকে জ্ঞান প্রদান করেন তিনিই জ্ঞানী। তিনি যাকে শক্তি প্রদান করেন তিনিই শক্তিমান। তিনি যাকে সাহায্য প্রদান করেন তিনিই সাহায্যপ্রাপ্ত। তিনি যাকে বিজয় দান করেন তিনিই বিজয়ী।

ইতিহাসে তো এরকম দৃষ্টান্ত আছে অনেক। এই উপমহাদেশেই আবির্ভূত হয়েছিলেন শহীদে বালাকোট সৈয়দ আহমেদ বেরলভী (রঃ)— জাহেরী এলেম শিক্ষা যাঁর নসিব হয়নি। কিন্তু তিনি আল্লাহ্পাকের রঙ্গে রঞ্জিত ছিলেন বলেই, আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন বলেই মাওলানা ইসমাইল শহীদ (রঃ), মাওলানা আবদুল হাই (রঃ) এর মতো বিখ্যাত আলেমগণও গ্রহণ করেছিলেন তাঁর শিষ্যত্ব। জেহাদের ময়দানেও মেনে নিয়েছিলেন তাঁর নেতৃত্ব।

হজরত হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রঃ)। তিনি ছিলেন জাহেরী এলেমে বুৎপত্তিবিবর্জিত এক বিস্ময়কর বুজুর্গ। বিশ্ব বিখ্যাত আলেম মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ), মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী র. এবং মাওলানা কাশেম নানতুবী র. এর মতো আলেমগণের পীর ছিলেন তিনি।

ভাবতে থাকেন হজরত হাকিম আবদুল হাকিম (রঃ)। না। ভয় কিসের। দ্বিধা কিসের। আল্লাহ্পাক কর্তৃক যিনি সাহায্যপ্রাপ্ত তার আর চিন্তা ভাবনা কিসের। অত্যন্ত সন্তর্পণে তিনি পা বাড়ালেন এ পথে।

প্রথম তাঁর কাছে বায়াত গ্রহণ করলেন একজন উর্দুভাষী ব্যক্তি। হিন্দুস্তানের বিহার প্রদেশ থেকে তিনি হিজরত করে এসেছেন পাকিস্তানে। বায়াত হবার পর তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। হেকিম সাহেবের মধ্যে এ কোন নেয়ামত লুকিয়ে আছে। তাঁর তাওয়াজ্জোহ্ এর মধ্যে এ কোন বিস্ময়কর প্রেমের প্রস্রবণ।

প্রিয় পীরের রূহানী সহায়তায় মোজাদ্দেদিয়া তরিকার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অতি দ্রুত তিনি অতিক্রম করতে লাগলেন সুলুকের মঞ্জিলসমূহ। দাওয়াত দিলেন নিজের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে। ক্রমে ক্রমে মুরিদের সংখ্যা বাড়তে লাগলো হজরতের। যশোরে বসবাসকারী উর্দুভাষী মোহাজেরগণের মধ্যেই অপেক্ষাকৃত বেশি বিস্তার লাভ করলো হজরতের তরিকা। স্থানীয় লোক খুব কম। দু'চার পাঁচ জন যারা আসে

তাঁদেরকে নিয়ে তিনি দাওয়াখানার আলমারীর পিছনে শুরু করেন মোরাকাবা। তাঁর নেসবতের নূর বিম্বিত হয়ে ওঠে মুরিদগণের সমস্ত অবয়বে। আল্লাহ্ প্রেমের নেশায় মগ্ন হয়ে যায় হজরতের অতি ক্ষুদ্র এই মোরাকাবা মহফিল।

আশেক ব্যক্তিগণের ছোট্ট জামাত। হজরতের চিন্তা এই জামাতকে কেন্দ্র করেই প্রসারিত হতে থাকে। মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, যে আন্দোলনের উৎপত্তি আজ এই অনাড়ম্বর দাওয়াখানায় তা একদিন শুধু এদেশে নয়, সমস্ত বিশ্বে নাড়া দিয়ে উঠবে। যে আগুনে বিরাট শহর জনপদ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, দিয়াশলাইয়ের ক্ষুদ্র কাঠির মধ্যেই তো তার উৎপত্তি। অতিকায় বৃক্ষের উৎপত্তিস্থল তো মাটির গভীরে প্রোথিত ছোট্ট মূল থেকে।

হজরত নিজ কাজে রত থাকেন। রূহানী ফরজন্দগণের রূহানী সত্তা প্রতিপালন করেন। মনে আশা জাগে, সবাই একদিন বড় হবে। তুলে ধরবে আবার দ্বীনের সেই ভূলুণ্ঠিত নিশান, ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীর পরতে পরতে— বিস্মৃত মানুষকে জাগাবার জন্য, দ্বীনের পূর্ণরূপ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য।

কাফেলা ক্রমে বড় হয়। হজরত অনুভব করলেন, একটা খানকার প্রয়োজন এবার। যেখানে নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহ্ প্রেমের মহফিল বসানো যায়। এক আল্লাহ্ প্রেমে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে নিশ্চিন্তে বিলীন হওয়া যায়।

কিছুদিন পর ছোট্ট কুটিরের সামনে মাটির দেয়াল দিয়ে খানকা নির্মাণ করা হলো। উপরে টালির ছাদ। খানকার দক্ষিণ পাশে প্রবেশ করবার দরোজা। তিনটে জানালা লাগানো হলো। পশ্চিম পাশে অপ্রশস্ত সরু বারান্দা। বারান্দার পশ্চিম পাশে লাগানো হলো মানি প্ল্যান্টের গাছ। বড় বড় পাতায় অল্পদিনের মধ্যে গোটা বারান্দা জুড়ে বিস্তৃত হয়ে পড়লো মানি প্ল্যান্ট। দেখলে মনে হয়, যেনো এই লতানো বৃক্ষটিও খাঁটি আশেকের মতো মাটির খানকার বুকে বুক লাগিয়ে আল্লাহ্ প্রেমের শারাবন তহুরা পান করছে।

খানকার পূর্বপাশে সফেদা গাছ। একটু দূরে গুবাক তরুর সারি। তেজপাতা গাছ আর দারুচিনি গাছ কয়েকটা। সবকিছুই প্রাণময়, প্রেমময়।

মাটির খানকায় সারাক্ষণ প্রজ্জ্বলিত থাকে ইশকের শামাদান। উন্মুক্ত দুয়ার। খোলা আমন্ত্রণ। আলোর আশেক কে আছো পিপাসিত। পথিক কে আছো পথহারা। কে আছো বন্দী নিজের সত্তার কারাগারে। এখানে আছে আলোর আদিগন্ত প্রান্তর। প্রেমের প্রপাত। মুক্তির মঞ্জিলের মহীয়ান মোর্শেদ।

দরবারে ভীড় জমে ওঠে ক্রমশঃ। হজরত এবার জামাতকে সুশৃঙ্খল রূপ দিতে চাইলেন। শুধু সাতক্ষীরায় নয়, যশোরে নয়। নেসবতে সিদ্দিকীর এই আমন্ত্রণ ছড়িয়ে দিতে হবে সবখানে। দ্বীন ইসলামের প্রাণ প্রবাহ বইয়ে দিতে হবে দেশ বিদেশের আশেকে ইলাহীগণের বুক থেকে বুকে। বুকে বুকে হয়তো আবার জ্বলে

উঠবে ত্যাগের বিস্মৃত শিক্ষা। বিভ্রান্ত উম্মতে মোহাম্মদীর (সঃ) জবানে আবার উচ্চারিত হবে, আমার সালাত, আমার যাবতীয় সৎকার্যসমূহ, আমার জীবন, আমার মুত্যু— সমস্ত কিছুই বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্যই। আল্লাহ্‌র জন্যই।

সারা দেশে গণ অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠছে। শেষ পর্যন্ত ঘটনা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কে জানে। জনতা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। যে পাকিস্তান আন্দোলনের জোয়ারে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলো এদেশের মানুষ, আজ তার অস্তিত্ব সম্পর্কেই জনতা সন্দিহান। শাসকবৃন্দের মিঠে বুলি আর তাদের অন্তর স্পর্শ করে না।

মানুষের কতো আশা ভরসা ছিলো। ইনসানিয়াত প্রতিষ্ঠিত হবে এদেশে। নেতার মুখে ঝংকৃত হয়েছিল, কোরআন এবং সুন্নাহ্‌ই হবে এদেশের শাসনতন্ত্র। কবির মুখে উচ্চারিত হয়েছিল পাকিস্তান হবে 'মজলু মানের মঞ্জিল মহীয়ান।' কিন্তু তা হয়নি। কার দোষে? কার অপরাধে আজ দেশের পূর্বাঞ্চলে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে গণঅসন্তোষ। যে পাকিস্তানের জন্য জনতা এক সময় জান কুরবান করতে কুণ্ঠিত ছিলো না, তারাই আজ দেশ বিভক্তির জন্য তৎপর।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত। 'কুল্লু মুসলিমুন ইখওয়াতুন।' সমস্ত মুসলমান ভাই ভাই— এ কথা আজ ভুলে গেছে সবাই। এখন একে অপরের দুশমন। একই নবীর উম্মত হিসাবে নয়, ভাই হিসাবে নয়— ভাষার ভিত্তিতে, ভৌগলিক ভিত্তিতে আলাদা পরিচিতির আড়ালে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে সবার মধ্যে নফসানিয়াত, আত্মম্ভরিতা, ক্রুরতা, হিংস্রতা।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলো কিছুদিন পরেই। শুরু হলো সংঘর্ষ, যুদ্ধ। ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি, কাটাকাটি, ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত হলো নিজেদের হাত।

হজরত চেয়ে চেয়ে দেখলেন সব! কি করবেন তিনি। কাকে বোঝাবেন? কে বুঝবে, মুসলমানের তলোয়ার মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত হতে পারে না।

হজরতের মুরিদগণও ভাগ হয়ে গেলেন দুই ভাগে। কেউ পক্ষে, কেউ বিপক্ষে। কেউ কেউ অস্ত্র তুলে নিলো হাতে। কেউ থাকলো নিরপেক্ষ। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলো কেউ কেউ। কোন্ পরিস্থিতিতে কার দাবী সঠিক, এই জটিল পরিস্থিতিতে কি করে তা নির্ণয় করা যায়। কোন্ পক্ষে যোগ দেয়া যায়।

হজরত সবকিছু দেখলেন নীরবে। অন্তরে অসহনীয় ব্যথা। আহ্। নিজের বুকেই সবাই ছুরি বসাচ্ছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে দেশ। ভাইয়ের রক্ত মিশে যাচ্ছে ভাইয়ের রক্তের সঙ্গে।

আবার বিশ্বের মানচিত্রে মাথা তুলে দাঁড়ালো নতুন আর এক দেশ, বাংলাদেশ। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে শুরু হলো অনাচার, শোষণ, ধর্মদ্রোহিতা। আহা মানুষের কি কষ্ট! কবে আমাদের চৈতন্যোদয় হবে? শোষণ বঞ্চনার কবে হবে অবসান?

যুদ্ধ বিধ্বস্ত নতুন দেশে নতুন উদ্যমে তরিকা প্রসারের কাজ শুরু করলেন হজরত। আহা, মানুষ যদি এই বুকের ভাষা বুঝতো। শান্তি কোথায়? সুখ কোথায়? পাকিস্তান আন্দোলনের নেতাদের কাছে— বাংলাদেশ আন্দোলনের নেতাদের কাছে, কারো কাছে শান্তির আশা করতে পারে না একজন মর্দে-মুমিন। যার দিল জাগ্রত, আল্লাহ্ প্রেমে উন্মত্ত, আল্লাহ্র স্মরণে বিভোর— সে-ই কেবল শান্তির স্বাদ পেতে পারে। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'আলা বি জিকরিল্লাহি তাত্মাইন্নুল কুলুব' (আল্লাহ্পাকের জিকিরই অন্তরে প্রশান্তি আনে)।

সেই জিকির, মেহেরবান প্রভুর স্মরণ দিল থেকে দিলে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যেমন পূর্ব জামানার ফকির সম্প্রদায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছিলেন সমস্ত জীবন ধরে। হজরত তেমনি সিপাহ্সালারের মতো তাঁর নূরানী কাফেলা নিয়ে এখানে ওখানে সফর করতে শুরু করলেন। আবেগমথিত কণ্ঠে বললেন, 'আমি পীরি মুরিদি করিনে— আমি চাই দ্বীনের প্রসার।' তাঁর কথায় প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো চারশ' বছর আগের দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মোজাদ্দেদের বাণী, "আল্লাহ্পাক আমাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন তার তুলনায় পীরি মুরিদি পথ ফেলে দিবার বস্তু।" তারও পূর্বে হজরত খাজা ওবায়দুল্লাহ্ আহরার (রঃ) এর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিলো এরকমই কথা, 'আমি যদি শুধু পীরি মুরিদি করতাম তাহলে অন্য কোনো পীর মুরিদ পেতেন না।'

তরিকত শিক্ষার জন্যই পীরি মুরিদি প্রয়োজন হয়। তরিকত শরীয়তের সহায়তাকারী, খাদেম সদৃশ। তিনটি উপকরণের সমন্বয়ে শরীয়ত— এলেম, আমল এবং এখলাস। এখলাস (বিশুদ্ধ নিয়ত) অর্জনের জন্যই সুফিয়ানে কেরামের তরিকায় দাখিল হতে হয়। হাদিস শরীফে এসেছে, শয়তান মানুষের কলবে বসে থাকে। যদি কলব জিকিরে রত থাকে, তবে শয়তান কলবে আর থাকতে পারে না। আর যদি কলব গাফেল থাকে, তবে শয়তান পুনরায় কলবে বসে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে।

প্রত্যেক মানুষের অন্তরে তাই সারাক্ষণ জিকির জারী রাখা প্রয়োজন। তা নাহলে শয়তানের প্রভাব থেকে কলব মুক্ত হতে পারবে না। আর শয়তান প্রভাবিত কলব নিশ্চয় অপবিত্র, অশুদ্ধ। নিয়তের উৎপত্তিস্থল এই কলব যার অশুদ্ধ থাকবে, তার নিয়তও হবে অশুদ্ধ। নিয়ত শুদ্ধ না হলে কোনো নেক আমলই আল্লাহ্পাকের দরবারে গৃহীত হবে না। কারণ, হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'নিয়ত অনুযায়ী আমলের (কার্যের) বিচার করা হবে।' নিয়ত শুদ্ধ হলে আমল শুদ্ধ হবে— আর নিয়ত অশুদ্ধ থাকলে আমল অশুদ্ধ হবে।' হাদিস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, 'নিশ্চয়ই তোমাদের শরীরে একখণ্ড মাংসপিণ্ড আছে। সেই মাংসপিণ্ড যদি শুদ্ধ হয় তবে শরীরও শুদ্ধ হবে

আর তা অশুদ্ধ থাকলে শরীরও থাকবে অশুদ্ধ।' আল্লাহ্পাকের ইবাদত করতে গেলে বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। তাই বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জনের সাথে সাথে কলবের পবিত্রতা অর্জনও একান্ত জরুরী। না হলে অশুদ্ধ অন্তর থেকে উত্থিত অশুদ্ধ নিয়ত, খালেস দ্বীন অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। আর আল্লাহ্পাকের জন্য খালেস দ্বীন আবশ্যক। যেমন তিনি এরশাদ করেছেন, 'সাবধান হও। আল্লাহ্পাকের জন্য খালেস (বিশুদ্ধ) দ্বীন আবশ্যক।'

শরীয়তের সহায়তাকারী, শরীয়তের এক তৃতীয়াংশ— এখলাস অর্জনের জন্য তরিকা শিক্ষা দেন যাঁরা, তাঁরাই পীর বা মোর্শেদ। এই পীর মোর্শেদগণের মধ্যে আল্লাহ্পাক কাউকে কাউকে পূর্ণ শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ণ দ্বীন প্রসারের জন্য নিয়োজিত করেন। তাঁরাই মোজদ্দেদ নামে অভিহিত হন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি হয় আরও উচ্চ। আরও প্রসারিত। শরীয়তের পূর্ণ প্রতিষ্ঠাই যাদের চিন্তা চেতনাকে সারাক্ষণ আলোড়িত করে, নিশ্চয় শুধু পীরি মুরিদি তাঁদের নিকট আকর্ষণীয় কোনো বিষয় নয়। কিন্তু তাই বলে পীরি মুরিদি অপ্রয়োজনীয় নয়। পীরি মুরিদি মাটির তুলনায় আকাশের মতো উচ্চ। কিন্তু দ্বীন প্রসার প্রতিষ্ঠার কাজের তুলনায় আরশের মতো যা আকাশের তুলনায় আরও অনেক উঁচু স্তরের। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, যারা শরীয়তের পূর্ণ অংশ অর্জন (এলেম, আমল, এখলাস) করতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁদের মধ্য থেকেই দ্বীনের প্রতিষ্ঠাকারী ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব ঘটে।

দেশের বিভিন্ন স্থানে সফর শুরু করলেন হজরত হাকিম আবদুল হাকিম। কোনো আড়ম্বর নেই। শান শওকত নেই। কোনো স্থানে গিয়ে জিন্দাবাদ ধ্বনি পাবার প্রত্যাশী তিনি নন। মনে শুধু বাসনা, মানুষ আল্লাহ্পাকের স্মরণের মধ্যেই দুনিয়া আখেরাতের কামিয়াবি অনুসন্ধান করুক। আল্লাহ্পাকের রঙ্গে রঞ্জিত হোক সবাই। ক্রমে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র— সারা বিশ্ব লাভ করুক দ্বীন ইসলামের পূর্ণ আলোক। মানুষ নিয়েই তো সমাজ, মানুষ নিজেই তো এক একটি রাষ্ট্র। এই মানুষের অন্তরের অঙ্গন যদি বিরান থেকে যায়— অন্তরে যদি না জেগে ওঠে আল্লাহ্ প্রেমের উত্তাল তরঙ্গমালা, তবে কি করে স্থাপিত হতে পারে প্রকৃত ইসলামিক রাষ্ট্র? সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এমনকি রাষ্ট্র নেতাগণের কলব থেকে চিরতরে শয়তানকে বিতাড়িত করে সেখানে আল্লাহ্পাকের বিরতিহীন স্মরণ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। আল্লাহ্পাকের স্মরণ বিস্মৃত রাষ্ট্রনায়ক কি করে দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন ইনসাফ। শোষণ বঞ্চনাহীন সমাজ ব্যবস্থা। ইসলাম আকমল দ্বীন। পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। কিন্তু আমরা এর পূর্ণতা অর্জন করতে গড়িমসি করি। কেউ শরীয়তের সুরত (আকৃতি) আঁকড়ে ধরেই মনে করি কার্যসিদ্ধি হয়েছে। আবার কেউ হকিকতের নাম করে, তরিকতের নাম করে আমদানী করেছি পবিত্র পীরি মুরিদির ক্ষেত্রে রাশি রাশি বেদাত ও কুসংস্কার। ফলে, আমরা কেউ হয়েছি ওলামায়ে ছু' (অসৎ আলেম),

কেউ হয়েছি দুনিয়াদার রাষ্ট্রনায়ক আবার কেউ তরিকতের ক্ষেত্রে শুরু করেছি ভণ্ডামি। দুনিয়াদার রাষ্ট্র নায়ক, দুনিয়াদার আলেম এবং ভণ্ড পীর— এই তিন দলই দ্বীনের প্রকৃত শত্রু। সাধারণ মুসলমানদের দ্বারা দ্বীনের কোনো ক্ষতি হয় না। ঐ তিনটি দলের দ্বারাই দ্বীনের নামে বেদ্বীনির আমদানী হয়।

খুলনা শহরে ভালো সাড়া পাওয়া গেলো। শহরের বিভিন্ন স্থানে হজরত গড়ে তুললেন সালেকবৃন্দের ছোট ছোট জামাত। প্লাটিনাম জুট মিল এলাকা, মহেশ্বরপাশা, বড় বয়রা, বসু পাড়া প্রভৃতি স্থানে বসতে লাগলো নিয়মিত জিকির ও মোরাকাবার মহফিল। যশোরের নতুন খয়েরতলা, কালীগঞ্জ, হেলাই এবং আরও অন্যান্য স্থানেও তরিকা প্রসারিত হলো।

হজরত এবার নজর দিলেন উত্তরবঙ্গের দিকে। প্রথম সফরে তিনি একাই বেড়িয়ে পড়লেন। হাতে একটি ব্যাগ এবং একটি লাঠি। কোনো বাহ্যিক আড়ম্বর নেই। অন্তর যাঁর পূর্ণ, বাইরের সাজসজ্জা ও আড়ম্বরের প্রতি কি তাঁর ভ্রূক্ষেপ থাকে?

ক্রমে ক্রমে উত্তরবঙ্গের চিলমারী, হারাগাছ, কুড়িগ্রাম, বুড়ীর হাট; দিনাজপুরের বিরামপুর এবং পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল, রাজশাহী শহরে মান্দা থানা এলাকায়, পাবনার শাহাজাদপুরে প্রসারিত হলো তাঁর জামাত।

তিনি এলেন ঢাকায়। প্রথম প্রথম ঢাকায় তেমন তাছির হলো না। কয়েকবার সফরের পর প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো। ঢাকার স্থানীয় অধিবাসী এবং অন্যান্য জনসাধারণ তাঁর নিকট বায়াত হতে শুরু করলেন।

এরই মধ্যে সফর করলেন চট্রগ্রাম, কুমিল্লার ফরিদগঞ্জ, নবীনগর— এই সমস্ত এলাকায়। পূর্বাঞ্চলে তেমন আশানুরূপ সাড়া পাওয়া গেলো না। কিন্তু দমলেন না তিনি। সফর জারী রাখলেন বিভিন্ন স্থানে।

সাতক্ষীরার আশে পাশেও বিস্তৃত হয়ে পড়লো হজরতের জামাত। পারুলিয়া, সারসা, প্রতাপনগর, কলিমাখালি, বেউলা এসব জায়গাতেও তরিকার প্রসার হলো। সাতক্ষীরা শহরের লোকও ক্রমশঃ আগ্রহী হয়ে উঠলো তরিকা গ্রহণের জন্য।

কেউ কেউ শুরু করলো বিরোধিতা, সমালোচনা। উনিতো আলেম নন, উনি আবার পীর হলেন কবে— এসব নানা সমালোচনায় জর্জরিত হতে থাকলেন হজরত। কিন্তু তিনি নির্বিকার। সবারই সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলেন। কারো সঙ্গে দেখা হলে আগেই সালাম দেন।

সমস্ত নবী, সমস্ত অলিকেই পৃথিবীর সব স্থানে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়াতো সুন্নত। হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ (রহঃ) এরশাদ করেছেন, 'সমালোচনা ও তিরস্কার আউলিয়া কেরামের কপালের লিখন।'

বিরোধিতা যতো বাড়তে থাকে, ততোই বেশী করে বিস্তৃত হয়ে পড়ে হজরতের জামাত। হজরত বলেন, 'এযে আগুন, যতো বাড়ি পড়বে ততোই জ্বলি-জ্বলি ওঠবে।'

ভারতের রাজধানী দিল্লীতেও ছোট খাট মজবুত জামাত গড়ে ওঠে হজরতের। সেরহিন্দ শরীফ সফরকালে দিল্লীতে অবস্থানের সময় পুরানো দিল্লীর কিছু লোক তাঁর কাছে বায়াত গ্রহণ করেন। কলকাতার পার্ক সার্কাস এলাকাতেও নতুন মুরিদ বাড়ে। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি (রঃ) এর রওজা শরীফ জেয়ারতের জন্য কয়েকবারই সেরহিন্দ শরীফ যান তিনি। শেষ সফরের সময় সেরহিন্দ শরীফে তুরস্কের লোক বায়াত গ্রহণ করেন।

কাফেলা ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। দূরবর্তী মুরিদগণকে চিঠিপত্রে মোর্শেদের সঙ্গে সংযোগ রাখবার জন্য তিনি তাগিদ দেন বারে বারে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে, হিন্দুস্তান থেকে প্রতিদিনই অনেক চিঠি আসে। ইশকের উন্মাদনা আর রূহানী মঞ্জিল অতিক্রমণের বিচিত্র বর্ণনায় ভরপুর সে সমস্ত পত্র। হজরত জবাব দেন সে সমস্ত চিঠির। প্রয়োজনীয় নসিহত করেন চিঠিতে। কাউকে কাউকে জানান রূহানী মঞ্জিলসমূহ অতিক্রমণের সুসংবাদ। চিঠিপত্র ফেলে রাখেন না তিনি। কতো আগ্রহ নিয়ে চাতক পাখির মতো প্রিয় মোর্শেদের চিঠির জন্য প্রতীক্ষায় থাকে সবাই। তাই চিঠির জবাব দিতে তিনি দেরী করেন না মোটেও। কোনো কোনোদিন চিঠির জবাব দিতে রাত হয়ে যায় অনেক।

মাটির খানকা মুখর হয়। মোর্শেদের মোবারক সহবত লাভের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এসে হাজির হতে থাকেন আশেকের দল। তাঁদের খেদমত করেন তিনি। নিজে বাজারে যান। মেহমানদের জন্য উত্তম খাবারের ব্যবস্থা করেন। বেশীর ভাগ সময় নিজে হাতে রান্না করেন। তারপর খাবার সময় মুরিদগণের সামনে বসে আহারের তদারকি করেন। ঠিক যেমনটি করেন পিতা মাতা। এভাবে মুরিদগণকে খাওয়ানো ছিলো তাঁর প্রিয় কাজ। তৃপ্তিতে ভরে ওঠে হজরতের মুখ। আহা। আল্লাহ্ প্রেমিক এরা। কতো দূর দূরান্ত থেকে ছুটে এসেছে ইশকের টানে। এরা যে আমারই কলিজার ধন। পেয়ারা ফরজন্দ।

মহফিল সরগরম হয়। মাটির খানকা ডুবে যায় নূরের বন্যায়। নক্ষত্রের মতো দীপ্তিমান মুরিদগণের মাঝে বসে থাকেন হজরত। পূর্ণ শশী যেনো।

তাকিয়া নেই তাঁর নিজের জন্য। নেই মখমল বিছানো আলাদা আসন। পুরাতন কাপড়ে সেলাই করা একটা পাতলা কাঁথার উপরে বসেন তিনি মাগরিব এবং ফজর নামাজ বাদ। সবাইকে নিয়ে মোরাকাবায় নিমগ্ন হন। আল্লাহ্ প্রেমের অথৈ পাথারে মুরিদগণকে নিয়ে তিনি ডুবতে থাকেন, ভাসতে থাকেন।

দিনের বেলা তিনি কর্মব্যস্ত মানুষ। ওষুধ ঘরে ওষুধ তৈরী করতে হয়। বিভিন্ন ধরনের গাছ গাছালী, মূল, লতা পাতা, যোগাড় করতে হয়। সবকিছু পরিমাণ মতো মেলাতে হয়। উনুনে চড়িয়ে জ্বাল দিতে হয়। ওষুধ তৈরী হয়ে গেলে বোতলে পূরতে হয়।

দাওয়াখানায় বসেন নিয়মিত। রুগী পত্র দেখেন। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা পত্র দেন। কখনো কখনো বাড়ীতেও রুগীপত্র আসে। তাদেরকেও দেখাশুনা করতে হয়। কখনো দূর গ্রাম থেকে ডাক এলে যেতে হয়। মহামারী, মড়ক আক্রান্ত গ্রামে— সব জায়গাতেই তিনি যান ডাক এলে।

নিজে বাজার ঘাট করতে হয়। প্রায় সময়ই নিজে হাতে রান্না বান্না করতে হয়। প্রতিদিনের চাল ডাল-সাংসারিক খরচ প্রতিদিনই করতে হয়। যা রোজগার হয়— তাই খরচ করে ফেলেন। জমানো কিছু থাকে না। পরের চিন্তা পরের দিন। পরের দিনের জন্য কোনো চিন্তা ভাবনা নেই তাঁর। আগামী দিনের চিন্তা করবেন কেনো তিনি। তিনি যে প্রকৃত ফকির। আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ তাওয়াক্কালকারী খাঁটি বান্দা। নিশ্চয় আল্লাহ্পাকই মোমেন বান্দাগণের অভিভাবক। হজরত তো নিজের শক্তির উপরে নির্ভরশীল নন। আল্লাহ্পাকের শক্তিতে তিনি শক্তিমান। আল্লাহ্পাকের দীপ্তিতে দীপ্তিমান।

মাঝে মাঝেই হাসিমুখে বলেন তিনি, 'ফকিররাই তো বাদশাহ্।' হ্যাঁ, হ্যাঁ বাদশাহ্ না তো কি। কালকের চিন্তা যার নেই সেই তো বাদশাহ্।

সাধারণ মানুষের মতোই অতি সাধারণ জীবন যাত্রা তাঁর। সিলসিলায়ে মোজাদ্দেদিয়ার বুজুর্গগণ এরকমই। বাহ্যিক আড়ম্বর জৌলুস তাঁদের মধ্যে থাকে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। অথচ তাদের চেহারায়, চলায় বলায় অভিব্যক্তিতে স্পষ্ট প্রকাশিত হয় অপার্থিব আলোর ঝলকানি। চোখ ধাঁধানো কিছু নয়। পুষ্পের মতো নীরব সৌন্দর্যের দীপ্তি। আশেকজনই শুধু আকৃষ্ট হয় সেদিকে। অন্য কেউ নয়। ভালো করে চেহারার দিকে তাকালে অন্তরের অন্ধকার সরে যেতে থাকে। অন্তর সাক্ষী দেয়, ইনিতো বরহক অলিআল্লাহ্। ইনিতো সত্য ফকির।

সালেকগণের দৃষ্টিতে তিনি মহাপুরুষ। প্রিয়তম পীর। আল্লাহ্পাকের দিকে পথপ্রদর্শনকারী মহান মোর্শেদ। কিন্তু সাধারণ অবোধ মানুষের নিকট হেকিম সাহেব। হিংসুক ব্যক্তিগণের নিকট যাদুকর।

দেশ বিদেশের নানা লোকজন যখন আল্লাহ্ প্রেমের পিপাসা মেটাবার জন্য হজরতের দরবারে আসতে শুরু করলেন, হিংসুকের দল তখন বলতে শুরু করলো, উনি আবার পীর হলেন কবে। লোকজনতো তাঁর কাছে আসে যাদুর প্রভাবে।

ঠিকই যাদুকরই তিনি। আখেরী জামানার পয়গম্বরের মতোই তিনি যাদুকর। মানুষের স্বভাব, সুরত, ব্যবহার পাল্টে যায় এই যাদুকরের কাছে এলে। মানুষের চিন্তা চেতনায় আলোড়ন ওঠে। বিস্মিত হন সবাই। কি বিস্ময়কর যাদু জানেন এই বুজুর্গ। মফস্বল শহরের এক অখ্যাত হাকিম। আল্লাহ্পাক তাঁকে বানিয়েছেন প্রেমের বিচিত্র যাদুকর। নবীজী (সঃ) এর মতো। তাঁর কাছে গেলে— তাঁর সহবতের তীব্র তাওয়াজ্জোহের প্রতিক্রিয়ায় ভুলে যায় সবাই পূর্বের কলুষিত স্মৃতি। সৃষ্টি হয় নতুন মানুষ।

জাহেলিয়াতের জুলমত আক্রান্ত আরব অধিবাসীগণ যাঁরা মদ্যপান, জুয়া, ব্যভিচার, লুণ্ঠন, শিশুহত্যা ইত্যাদির পাপ সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিলো সম্পূর্ণভাবে— শেষ জামানার নবী (সঃ) এর নূরের প্রভাবে তাঁরাই হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। সত্যের ধ্রুবতারা, হেদায়েতের চিরদীপ্তিমান নক্ষত্র। রসূলেপাক (সঃ) বললেন, 'আমার সমস্ত আসহাব নক্ষত্র তুল্য।'

রসূলেপাক(সঃ) এর নূরে পূর্ণরূপে রঞ্জিত হজরত হাকিম আবদুল হাকিম (রঃ) তেমনি তওবার (প্রত্যাবর্তনের) পথ প্রদর্শন করে হেদায়েতের আলোকে আলোকিত করে দিতে লাগলেন তালেবে মাওলাগণের ভিতর বাহির।

কি বিচিত্র যাদুর খেলা। ঘুষখোর সরকারী কর্মকর্তা, কম্যুনিষ্ট পার্টির বস্তুবাদী কর্মী, শরাবখোর, লম্পট, গানবাদ্যকারী, চোর ডাকাত সবাই যাদুর প্রভাবে বদলে গেলো। সবারই অন্তর্জগতে জারী হলো আল্লাহ্ প্রেমের নূরের সয়লাব। আল্লাহ্র জিকিরে উন্মত্ত হলো সবাই। নীরব বিরতিহীন জিকির— একেবারে অন্তরের অন্তঃস্থলে। ভিতরের আলো বাইরে প্রকাশিত হলো। সবারই শরীর সজ্জিত হলো শরীয়তের সাজসজ্জায়। পোশাক আশাক চেহারা সুরত সব বদলে গেলো। দেখলে আর বোঝাই যায় না— এরা কোনোকালে ছিলো দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী, অসৎ ব্যবসায়ী, গর্বোন্মত্ত আলেম, অধ্যাপক, দ্বীন ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, ভূতত্ত্ববিদ, অশিক্ষিত কৃষক, অপরিচ্ছন্ন দিন মজুর কিংবা উচ্ছৃঙ্খল শ্রমিক।

সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ হজরতের দরবারে এসে এক হয়ে মিলে গেলো। এখানে শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী দরিদ্র আলেম জাহেল সবাই বুকে বুক মিলিয়ে শিখলো, কিভাবে আল্লাহ্পাকের ওয়াস্তে পরস্পর পরস্পরের ভাই হতে হয়। এ যেনো সেই সমস্ত আল্লাহ্ প্রেমিকগণের প্রতিচিত্র যাঁদের শানে আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন 'রুহামাও বায়নাহুম তারাহুম।' নিজেদের মধ্যে তারা কুসুমের মতো কোমল।

সমালোচকরা নাদান। তাঁরা বুঝতে পারেন না, হজরত হাকিম আবদুল হাকিম ঠিকই যাদুকর। তবে বদলে গিয়েছে তাঁর অবস্থান স্থল। আগে তিনি ছিলেন শত্রুপক্ষে আর এখন মিত্রপক্ষে। সেই একই যাদুর তলোয়ার দিয়ে আজো যুদ্ধ করেন তিনি। তাঁর তলোয়ার যে এখন আলোর পক্ষে, অন্ধকারের বিরুদ্ধে উদ্যত।

তাঁর তলোয়ার এখন চমকায় আল্লাহ্ প্রেমের অপার্থিব দ্যুতি— ফারুকে আজম (রাঃ) এর মতো, খালেদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) এর মতো, ওমর বিন আবদুল আজিজ (রঃ) এর মতো, ফুজাইল ইবনে আয়াজ (রঃ), বেশার হাফী (রঃ), হাবীব আজমী (রঃ) এর মতো। সমালোচকগণতো অবুঝ। তাঁদের কানে কি রসূলেপাক (সঃ) এর এই বাণী পৌঁছেছে, 'কুফরিতে যারা শ্রেষ্ঠ, ইসলাম গ্রহণের পর তাঁরাই শ্রেষ্ঠ।'

হজরত আবদুল হাকিমের মধ্যে শৈশবকাল থেকেই ছিলো সাহসিকতা, তেজস্বিতা, প্রেম, দুর্বার কৌতূহল, কঠোর সাধনার নেশা, শেষ গন্তব্যে পৌঁছানোর দৃঢ়চিত্ততা, বিজয়ের পথে দুর্নিবার দৃঢ়তা। তিনি তো স্বভাবগত ভাবেই ছিলেন নির্লোভ, অর্থলোলুপতা থেকে মুক্ত, আসমানের মতো উদার অন্তকরণের অধিকারী। এসব দুর্লভ গুণাবলী তাঁকে আল্লাহ্পাক দান করেছেন জন্মগতভাবে। তবে এসমস্ত ছিলো আগে আল্লাহ্পাকের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত মতবাদের পক্ষে। আর এখন তাঁর যোগ্যতা, গুণাবলী, জীবন মরণ সমস্ত আল্লাহ্পাকের জন্য উৎসর্গীকৃত।

সমালোচকদের সমালোচনায় মনক্ষুণ্ন হন না হজরত। নবীজী (সঃ) এর মতোই আল্লাহ্পাক তাঁকে দিয়েছেন সকল স্তরের মানুষের জন্য গভীর মমত্ববোধ। আহা, যে অন্যায় করে, সেতো অবুঝ। অন্তরের রোগের কারণেই তো সে এরকম বলে। শরীর রোগাক্রান্ত হলে মানুষ যেমন রোগ যন্ত্রণার করণে ভুল বকে, হাত পা ছোঁড়ে, এমন কি নিজের শুশ্রূষাকারীকে পর্যন্ত গালাগালি করে; তেমনিই তো মানুষের অন্তর রোগাক্রান্ত হলে তার স্বাভাবিক জ্ঞান হয় এলোমেলো। বন্ধুকে মনে করে শত্রু। শত্রুকে বন্ধু। তার অন্তর রোগমুক্ত হলে সে কি এরকম কথা আর বলতে পারবে? তার চিনতে কি তখন কষ্ট হবে আল্লাহ্ওয়ালা ব্যক্তি কারা? শয়তানের সঙ্গে নয়, নফসের কামনা বাসনার সঙ্গে নয়— আল্লাহ্ওয়ালাগণের সঙ্গেই আল্লাহ্র ওয়াস্তে বন্ধুত্ব করা উচিত। আল্লাহ্পাক তো কারো বাধ্য নন। তিনি যাঁকে খুশী তাঁকে নিজের বন্ধুরূপে কবুল করেন। এ যে আল্লাহ্পাকের ফজল, তিনি যাঁকে খুশী তাঁকেই এই পুরস্কার প্রদান করেন— নিশ্চয়ই তিনি বহুত বড় ফজলওয়ালা।

হজরত সমালোচকদের সমালোচনায় মনক্ষুণ্ন হন না বরং শত্রু মিত্র সবারই জন্য তিনি দোয়া করেন, 'ইয়া আল্লাহ্ তুমি দেশবাসীকে হেদায়েত করো। প্রতিবেশীকে হেদায়েত করো।'

বাড়ীর বাইরের দিকের বারান্দায় কখনো কখনো বসেন তিনি। পাশে কেউ না থাকলে কি এক গভীর চিন্তায় থমথমে হয়ে উঠে তাঁর মুখাবয়ব। স্বচ্ছ কাঁচের মতো ঐ মুখমণ্ডলের রং পরিবর্তন হয় তখন। কখনো লাল টকটকে, কখনো গোলাপী, কখনো শ্বেতবর্ণ, কখনো সুরমার রং ফুটে ওঠে ঐ মুখের আয়নায়। পাশে লোকজন থাকলে সাধারণতঃ আনমনা ভাবটা থাকে না আর। লোকজন কম থাকলে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গল্পে মেতে যান তিনি। কৈশোরের স্মৃতিচারণ করেন। ছোট শিশুদের সারল্যে ভরপুর তাঁর বর্ণনাভঙ্গী। অনর্গল বলে যান, সেই

সাধুর গল্প, মমতাজ আলী শাহের গল্প, হিমালয়ের গুহার গল্প, সাইকেলে চড়ে দিল্লী শাহজানপুর যাবার গল্প।

কখনো বলেন, 'গভীর রাতে ওঠে পড়া ছিলো আমার অভ্যেস। উঠে ঘরের বাইরে যেতুম। দেখতুম, গাছপালা। আসমান। শুনতে চেষ্টা করতুম ঐ গাছ কি বলে, ঐ পাখি কি বলে। মনে হতো তারা মানুষকে ডাকে, হে আশরাফুল মখলুক, তোমার প্রভুর ইবাদত ছেড়ে ঘুমিয়ে আছো কেনো? ওঠো। কতো আর ঘুমাবে।'

কখনো বলেন, 'একদিন আমি পুকুরের ধার থেকে একটা চিঁ চিঁ আওয়াজ শুনতে পেলুম। আওয়াজ লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়ে দেখি একটা মোরগ বার বার ঠোকর মারছে একটা ছোট কাঁকড়ার বাচ্চাকে। মোরগ তাড়িয়ে দিয়ে কাঁকড়ার ছোট বাচ্চাটি আমি হাতে তুলে নিলুম। দেখলুম, কি অদ্ভুত কাঁকড়া। এরকম কাঁকড়া আমি জীবনে দেখিনি। গায়ের মধ্যে তার অনেক রং। খুব সুন্দর দেখতে। কাঁকড়াটার জন্য আমার মায়া হলো খুব। আহা কি নিরীহ জীব। আর একটু হলেই তো মোরগ তাকে জানে শেষ করে দিতো। আস্তে করে কাঁকড়াটাকে আমি পুকুরের পানিতে ছেড়ে দিলুম। নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে সে ডুব দিলো পানিতে। ঐ রাত্রিতেই আমি স্বপ্নে দেখলুম, হজরত রসূলেপাক (সঃ) এবং সঙ্গে তার আসহাব হজরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ), হজরত ওমর ফারুক (রাঃ), হজরত ওসমান (রাঃ) এবং হজরত আলী (রাঃ) আমার কাছে এলেন। বললেন তাঁরা, তোমাকে দ্বীনের কাজের জন্য মনোনীত করা হয়েছে।

কখনো বলেন, 'এক বয়োজ্যেষ্ঠ হিন্দু লোক আমাকে দেখলেই বলতো আস্‌সালামু আলাইকুম। কি করা যায়। আমি বুদ্ধি আঁটলুম মনে মনে। সালাম আদান প্রদান তো মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত একটি ইসলামী রীতি। এটা তো ধর্মীয় ব্যাপার। অন্য ধর্মালম্বীদের সঙ্গে সেই প্রথা তো চালু হতে পারে না। তাই আমি তার সালামের জবাবে বলতুম, আলীপুছ্ ছেলাম (আলীপুর ছিলাম)। অনেকদিন পর সেই হিন্দু লোকটি আমাকে বললে, আমি সালাম দিলে তুমি কি বলো বলো দিনি। মনে হয় তুমি তো ওয়া আলাইকুমুস সালাম বলো না। তখন আমি বাধ্য হয়ে তাকে খুলে বললুম ব্যাপারটা। বললুম, কি বলবো বলুন। মুসলমানদের মধ্যেই হয় সালামের আদান প্রদান। তাই আপনাকে তো আর সালামের জবাব দিতে পারি না। ওদিকে কিছু একটা জবাব না দিলে আপনিও মনক্ষুণ্ন হতে পারেন। তাই আপনি সালাম দিলে আমি বলি, 'আলীপুছ্ ছিলাম' (আলীপুর ছিলাম)। কথাটি ঠিকই, আলীপুর আমি কিছু সময় তো ছিলাম এককালে।

কখনো স্মৃতিচারণ করেন বড় বোনের। বলেন, 'বড়বু' মনসুর হাল্লাজের (রঃ) মতো হালে আক্রান্ত ছিলেন বহুদিন। সারাদিন জিকির করতেন 'আনাল হক' 'আনাল হক' বলে। আব্বা বাড়ীর বাইরে কোথাও গেলে কেড়ে নিতেন তাঁর মাকাম, যাতে তাঁর অবর্তমানে কোনো অঘটন না ঘটে যায়।'

পরে অবশ্য হজরতের বোন ঐ হাল থেকে মুক্তি পান। এবং তরিকতের মঞ্জিল সমূহ অতিক্রম করতে সক্ষম হন। সুস্থ্য সজ্ঞান অবস্থায় জিকির আজকারে দিনাতিপাত করতে থাকেন।

তাঁর গালবায়ে হালের জন্য বিবাহের পর সংসারেও মন বসাতে পারেননি তিনি। এক সন্তানের জননী হবার পরও সংসারের প্রতি মনোনিবেশ না করতে পেরে পিতৃগৃহেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। তিনি এদেশে আর আসেননি। সেই কালুতলা গ্রামের ছায়া ঢাকা আশ্রয় ছেড়ে আসতে রাজী হননি তিনি।

তবে মাঝে মাঝে বেড়াতে আসেন এখানে। সাতক্ষীরায়। কিছুদিন থেকে যান।

একবার এলেন। কিছুদিন পর বললেন, 'হাকিম আমাকে পাঠিয়ে দে কালুতলায়। মনে হচ্ছে আমি আর বেশীদিন থাকবো না দুনিয়ায়।'

সামনে কয়েকদিন পর মহফিল। বার্ষিক মহফিল। পিতা ও পীর হজরত আমিনউদ্দিন (রঃ) এর ইন্তেকালের তারিখ ১২ই অগ্রহায়ণে হজরত বার্ষিক মহফিল করতেন। এই মহফিলে দেশের বিভিন্ন স্থানের মুরিদগণ সমবেত হতেন। হিন্দুস্থানের দিল্লী, কলকাতা থেকেও আসতেন কেউ কেউ। হজরতের ইচ্ছা ছিলো, মহফিল পর্যন্ত রাখবেন বোনকে।

কিন্তু রাখা গেলো না তাঁকে। শেষ পর্যন্ত তাকে কালুতলায় পাঠিয়ে দিতে হলো। কয়েকদিন পরেই সংবাদ পেলেন হজরত, তার বড় বু' আর দুনিয়ায় নেই। মাশুকের দাওয়াত কবুল করেছেন তিনি।

বিষাদক্লিষ্ট মনে কিছুকাল অতিবাহিত করলেন হজরত। প্রিয় ভগ্নীর বিয়োগ ব্যথায় দুই চোখ ভিজে থাকে সব সময়।

সবাই যায়। এভাবেই যায়। একে একে সবাই চলে যাচ্ছে আসল আবাসে। হজরতের মনও বিবাগী হয়ে ওঠে। মন চলে যেতে চায় মূল বাসস্থানে। কিন্তু কাজ যে এখনো অনেক বাকী। কেবল চারাগাছে পাতা গজিয়েছে। এসবের যত্ন নিতে হবে। নিয়মিত পানি সিঞ্চন করতে হবে। মুক্ত রাখতে হবে এ সমস্ত বৃক্ষকে ঝড় ঝাপটা থেকে— আগাছার আক্রমণ থেকে। প্রসারিত করতে হবে প্রেমের বাগান দেশব্যাপী, বিশ্বব্যাপী।

আরো দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে তরিকা। হজরত আবদুল হাকিম ব্যাপকভাবে সফর করতে থাকেন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। কখনো ট্রেনে, কখনো বাসে, কখনো গরুর গাড়ীতে, কখনো নৌকায়।

উত্তর বঙ্গের সফরই সবচেয়ে বেশী কষ্টদায়ক। তবুও তিনি যান সেদিকে। শীত গ্রীষ্ম বর্ষায়। কতো ষ্টেশনে তাঁকে বসে থাকতে হয় ট্রেনের অপেক্ষায়। জংশনের প্লাটফর্মে কাটিয়ে দিতে হয় কতো রাত।

রংপুর থেকে চিলমারী গামী ট্রেনে জানালা নেই, আলো নেই। শীতকালীন সফরে হুহু করে হিমেল বাতাস ঢোকে। প্রচণ্ড শীতে আড়ষ্ট হয়ে আসে শরীর। সমস্ত রাত্রি জেগে কাটাতে হয়। তবুও হজরত নিয়মিত সফর করতে থাকেন উত্তর বাংলায়। চিলমারী থেকে গরুর গাড়ীতে যেতে হয় আরো কতো গ্রামে। গ্রাম কতো সুন্দর। গ্রামের মানুষও কতো সরল এখানকার। গ্রামের মেঠো পথে গরুর গাড়ীতে যেতে যেতে কখনো আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠেন তিনি। সাধারণ একজন হাকিম তিনি। আল্লাহ্পাকের দ্বীনের জন্য আজ তাঁকে ঘরবাড়ী ছাড়তে হয়েছে। কতো পথে প্রান্তরে ঘুরতে হচ্ছে। রসূলেপাক (সঃ) এর উম্মত আজ পৃথিবীর কতো স্থানে কতোভাবে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। বেশীর ভাগই দরিদ্র, সরল। তাদের বুকে রসূলেপাক (সঃ) এর বুকের নূর জ্বালাবার দায়িত্ব নিতে হয়েছে তাঁকে। কি মহান কাজ। আর কতো ক্ষুদ্র তিনি। মফস্বল শহরের একজন সাধারণ হাকিম।

'আমার আপাদমস্তক ত্রুটিপূর্ণ জেনেও তুমি আমাকে খরিদ করে নিয়েছো। আহা কি ত্রুটিপূর্ণ সামগ্রী আর কতোই না মেহেরবান ক্রেতা।'

হজরত ডুকরে কেঁদে ওঠেন, 'ইয়া আল্লাহ্ তুমি আমাকে কি এমন মর্যাদা দান করেছো। যার কলবে আমার আঙ্গুল স্পর্শ করি, তারই কলব সঙ্গে সঙ্গে নূরে ভরপুর হয়ে যায়। কতো নিকৃষ্ট আমি। কথা বলতে ভয় হয়। নিজের অযোগ্যতার জন্য ভয়ে কথা বলিনে। তুমি যেভাবে চালাও সেভাবেই চলেছি। পানির স্রোতের মাঝে ভাসমান শুকনো কাঠের মতো ভেসে চলেছি।'

হজরতের শিশুর মতো কান্না দেখে সহচরগণও অশ্রুসিক্ত হন। কি রকম অলি আল্লাহ্পাক বানিয়েছেন তাঁকে। প্রেমে ভরপুর মন। মানুষকে কতোইনা ভালবাসেন তিনি।

দিনাজপুরের সফরও কষ্টদায়ক। দীর্ঘ সময় ট্রেনে বসে থাকা। তারপর গ্রামের দিকে যেতে হলে আবার সেই গরুর গাড়ী। কখনো কখনো এমন স্থান পড়ে, যেখানে হেঁটেও যেতে হয়।

রংপুর শহরের পাশে বখতিয়ারপুর, বুড়ীর হাট, হারাগাছ। চিলমারী থেকে ফেরার পথে অথবা যাবার পথে এ সমস্ত স্থানসহ কখনো কখনো তিনি আরও অনেক স্থানে সফর করেন। কুড়িগ্রাম, উলিপুর, আরও কতো কতো জায়গা।

রাজশাহী শহর সফর করেন। শহর থেকে অনেক দূরে মান্দা থানার নিভৃত গ্রামাঞ্চল। মহানন্দা নদী পার হয়ে মহিষের অথবা গরুর গাড়ীতে চড়ে সেখানেও একবার যেতে হয়েছিল তাঁকে।

শাহজাদপুর, মাওয়া, কালীগঞ্জের সব সফরই কষ্টদায়ক। খুলনার বিভিন্ন অঞ্চল— বিশেষ করে গ্রামের সফর সত্যিই কষ্টদায়ক। শুধু খুলনা শহরের বিভিন্ন স্থান এবং যশোর যেতে কষ্ট কিছু কম হয়। ঢাকার দিকে যেতেও কষ্ট! চট্রগ্রামে যদি কখনো কখনো প্লেনে যাবার সুযোগ হয়, তবে জানে কিছু আরাম হয়।

যেখানে যেখানে তিনি সফর করেন সেখানকার সবাইকে আবার দাওয়াত করেন সেই মাটির খানকায় আসবার জন্য। বছরে কমছে কম একবার বার্ষিক মহফিলে এলে তিনি খুশী হন খুব।

মহফিলের কয়েকদিন আগে থেকে আনন্দে উত্তেজনায় অধীর হন তিনি। কলিজার সম্পদ প্রিয় ফরজন্দগণকে যে কিভাবে আপ্যায়ন করবেন ভেবে পান না। হাঁক ডাক করেন। এর ওর নাম ধরে ডাকাডাকি করেন।

কখনো পরামর্শ করেন ঘনিষ্ঠ মুরিদগণের সঙ্গে। জিজ্ঞেস করেন, 'তা সকাল বেলা নাস্তার কি ব্যবস্থা করা যায় বলে দিন।'

সবাই বিনয় সহকারে বলেন, 'ভাত তার সঙ্গে কিছু একটা তরকারী হলেই চলবে।'

সব প্রস্তাব নাকচ করে দেন তিনি। আনন্দে অধীর হয়ে বলেন, 'না না তাকি হয়। আপনাদের বাড়ীতে গেলে কতোকি আয়োজন করেন আপনারা আমার জন্য। আর আমার বাড়ীতে এয়েছেন। সকালে গরু জবাই করে দেব একটা।'

মহফিলের সপ্তাহ খানেক আগে থেকেই বাড়ীর সামনের জায়গাটার গাছ গাছালী আগাছা পরিষ্কার করবার জন্য কামলা লাগিয়ে দেন তিনি। বাঁশের খুঁটি পুঁতে প্যাণ্ডেল টাঙ্গানোর ব্যবস্থা করেন। দিনমজুরদের সংগে নিজেও খাটেন। গেঞ্জি গায়ে দিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করে যান উৎফুল্ল মনে। কখনো দড়ি ছিঁড়ে দেন। কখনো একটা ছোট টুলে বসে, কখনো দাঁড়িয়ে লোকজনদেরকে নির্দেশ দেন, 'ওটা এখানে দাও। বাঁধ দাও ভালো করে। এই বাড়া, এই বাড়া, হ্যাঁ, হ্যাঁ। বেশ হয়েছে।

মহফিলের দুই চার দিন আগে থেকেই মুরিদ ভক্তের দল আসতে থাকে। রাতে সবার শোবার জায়গা হয় না ছোট মাটির খানকায়। কাজেই বেশীর ভাগ মুরিদই বাইরে প্যাণ্ডেলের নিচে থাকেন। চারিদিকে খোলা। শীতকাল। অগ্রহায়ণের তীব্র শীত। সাতক্ষীরাতে শীত পরে খুব।

তবুও কারো কষ্ট বোধ হয় না তেমন। প্রিয় মোর্শেদের সহবত লাভের আনন্দের কাছে কোনো কষ্টই যেনো কষ্ট নয়। নূরের বন্যায় ভরা এই মহফিলের জ্যোতিচ্ছটার ঝলকানিতে মুছে যেতে চায় পেছনের সকল স্মৃতিচিত্র।

রাতের বেলা আরো অস্থির হয়ে উঠেন হজরত। শোবার সময় হলে বাইরের অপ্রশস্ত বারান্দায় টেনে আনেন নিজের বিছানা। 'ঠাণ্ডায় তাঁর কষ্ট হতে পারে' এধরনের কথা কেউ বললে বলেন তিনি, 'না না সবাই বাইরে ঠাণ্ডার মধ্যে রয়েছে আর আমি একা ঘরের ভিতরে থাকবো?'

বারান্দার প্রান্তে কাউকে বিছানা করে শুয়ে পড়তে বলেন। নিজের পাশের সামান্য জায়গাটাতেও শুয়ে পড়তে বলেন কাউকে। নিজের কম্বল কাউকে দিয়ে বলেন, 'নাও গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ো। এটা আমার খাস কম্বল, কাউকে দেইনে বড়।'

সবাই ঘুমিয়ে পড়লেও হজরতের চোখে ঘুম আসে না। কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে থেকে আবার উঠে পড়েন তিনি। শীতে কেউ কষ্ট পাচ্ছে কিনা কে জানে। উঠে ঘুরে ঘুরে দেখেন সবাইকে। কারো গায়ের লেপ কম্বল ঘুমের ঘোরে সরে গেলে, ঠিকঠাক করে দেন। আহা। কতো দূরের লোক। আল্লাহ্ আল্লাহ্র রসূলের টানে এসেছে। কি করি। কোন বুকে রাখি এদেরকে।

মহফিলের দিন কর্মব্যস্ততা আরো বেড়ে যায় তাঁর। ওদিকে রান্ন বান্নার আয়োজন করতে হয়। নিজেকেই দেখা শুনা করতে হয় সবকিছু। কারো কাছে তদারকের ভার দিতে ইচ্ছা হয় না। নিজের হাতে খেদমত করতেই তাঁর আনন্দ।

মহফিলের দিন ফজরের নামাজের পরেই কোরআন তেলাওয়াতের মহফিল বসে যায়। প্রায় জোহরের আগে পর্যন্ত চলে এই মহফিল।

জোহরের নামাজ হয়ে গেলে আহার এবং সামান্য বিশ্রাম। শীতকালের দিন। একটু পরেই হয়ে যায় আছরের ওয়াক্ত। এক আশেক আজান দেন। তাঁর আজান খুব পছন্দ করেন হজরত। সবাই পছন্দ করে। 'আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে নেচে উঠে সবার ধমনীর রক্তকণা। তীব্র নূর আর ফয়েজের প্রভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায় সবারই পার্থিব চিন্তা। আল্লাহ্ প্রেমের তুফানে তছনছ হয়ে যায় সবার মনের সঞ্চিত পার্থিব আগাছা–আবর্জনা। নূরে নূরে ভরে যায় মহফিল।

বাদ আছর শুরু হয় আলোচনা। শরীয়ত, তরিকত, হকিকত, মারেফত। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি (রহঃ) এর জীবন ধারা। আহলে সুন্নত জামাতের আকায়েদ। প্রেম। আল্লাহ্ প্রেম। রসূল প্রেম। রেয়াজত মোজাহেদার পদ্ধতি। আদব কায়দা। অনেক বিষয়ে আলোচনা চলতে থাকে সমস্ত রাত ধরে। আলেম ওলামা এবং উচ্চ মাকামধারী মুরিদগণ হজরতের নির্দেশে বক্তব্য রাখেন মজলিশে।

মাগরিব বাদ মোরাকাবা অনুষ্ঠানের পর আবার শুরু হয় মহফিল। হজরত আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেন। মনে হয় কতো কিছু বলতে চান তিনি। কিন্তু এমন ভাষা কোথায়, হৃদয়ের প্রেম সমুদ্রের বর্ণনা যার দ্বারা করা সম্ভব? এমন বাক্যাবলী কি আছে যার দ্বারা প্রকৃত মারেফতের বর্ণনা সম্ভব? যা বলা হয় তাতো মূলের বর্ণনা নয়। বরং মূলের দিকে বক্তার বক্তব্য শুধু ইঙ্গিত মাত্র। এ জন্যই হাদিস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, 'যে আল্লাহ্র মারেফত লাভ করেছে, তার রসনা রুদ্ধ হয়েছে।'

মোরাকাবার পর কখনো হয়তো তিনি কিছু বলতে শুরু করেন, 'আপনারা সবাই দূর দূরান্ত থেকে এয়েছেন— 'ব্যাস। এই পর্যন্তই। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আর কোনো কথা খুঁজে পান না তিনি। হয়তো মনে হয়, কি বলবো? যা বলতে চাই

তাকি বলা যায়? ইশকের কথা, দরদের কথা, 'আরেনি' আগুনের কথা তো কথা নয়, অন্যকিছু। হৃদয়ে হৃদয় রেখে জানতে হয় মারেফতের বিবরণ। কিভাবে কোন ভাষায় বোঝানো যাবে এসব কথা? আর যাদের উদ্দেশ্যে কথা, তাঁরা তো তাঁর বুকেই রয়েছেন। নিজের সত্তার মতোই আপন তারা। নিজের সঙ্গে নিজের কি কথা হয়?

কিছুক্ষণ চুপ থেকে হজরত পাশের ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'তা মওলানা সাহেব, বলা কওয়া করেন।' এটুকু বলেই মাইকের সামনে থেকে সরে যান তিনি। কখনো বারান্দায় একটা চেয়ার নিয়ে বসেন। কখনো ঘরে চলে যান— প্রবল আবেগ সম্বরণের জন্য। সামলে নিয়ে আবার আসেন। কখনো রান্না বান্নার জায়গায় গিয়ে বসেন। লেগে যান রান্না বান্নার কাজে। নিজে হাতে বড় চামুচ দিয়ে তরকারীর হাঁড়ি নাড়াচাড়া করেন।

এদিকে মহফিলে একের পর এক বক্তাগণ বক্তৃতা করতে থাকেন। যে কাজেই তিনি রত থাকেন না কেনো, হজরতের কান খাড়া। কোনো বক্তার কথার মধ্যে কিছু অসংলগ্নতা প্রকাশ পেলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে পাঠান, 'বন্ধ করতে বলুন। ওয়াজ ভুল হচ্ছে।'

এভাবে রাত বেড়ে চলে। আলোচনা মহফিল চলতেই থাকে। রাত চারটার সময় হয় আখেরী মোনাজাত।

মোনাজাতের সময় মঞ্চে আরোহণ করেন হজরত। আলোকিত মহফিল তাঁর চেহারার আলোর কাছে যেনো ম্লান হয়ে যেতে যায়। সূর্যের আলোকচ্ছটার মতো তীব্র উজ্জ্বলতা তাঁর সারা অবয়বে।

অসহায়ের মতো নিজের হাত দু'খানা তুলে ধরেন হজরত। তাঁর নূরানী দু'হাত যেনো আরশ স্পর্শ করে। তিনি নিজের নিকৃষ্টতা, অযোগ্যতা ঘোষণা করেন মহান মালিকের নিকট, ইয়া আল্লাহ্, আমি মূখ্য-সুখ্য মানুষ, পেটে বিদ্যে নেই।'

আহা। এই তো প্রকৃত বান্দার কথা। নিজের অজ্ঞতা, নিজের শক্তিহীনতা, নিজের অযোগ্যতা যে অকপটে আল্লাহ্র নিকট স্বীকার করতে পারে সেই তো প্রকৃত বান্দা— আব্দ। আল্লাহ্পাকের তরফ থেকে এলেম, শক্তি, সাহায্য, যোগ্যতা তো তারই নসিবে হয়।

হজরত দোয়া করতে থাকেন, 'ইয়া আল্লাহ্। আমরা যাহা কিছু কোরআন তেলাওয়াত করেছি— দ্বীনি আলোচনা করেছি, মিলাদ শরীফ দরুদ শরীফ পড়েছি, খতম শরীফ পড়েছি এবং এই মহফিলের জন্য যাহা কিছু তোবারকের আয়োজন করা হয়েছে, এ সমস্ত কিছুর ছোয়াব রসূলে মকবুল জনাবে মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সল্লাল্লহু আলাহি ওয়া সাল্লামের রূহ পাকে পৌঁছাইয়া দাও। কুল আম্বিয়া আ. এর আরওয়াহ্ পাকে পৌঁছাইয়া দাও। চার আসহাব, পাক পাঞ্জাতন, বারো ইমাম, শহীদ শহীদান, খাজা খাজেগানদের আরওয়াহ্পাকে পৌঁছাইয়া দাও। পীরে দস্তগীর

মাহবুবে সোবহানী গাউসে সামদানী হজরত মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী কাদ সারহুল আজিজের রূহ পাকে পৌঁছাইয়া দাও। গরীবে নেওয়াজ হজরত খাজা মইনউদ্দিন চিশতি আজমিরী (রঃ) এর রূহ পাকে পৌঁছাইয়া দাও। ইমামুত্ তরিকত হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশ্‌বন্দ (রঃ) এর রূহ পাকে পৌঁছাইয়া দাও, হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ(রঃ), ইমামে রব্বানী হজরত মোজদ্দেদে আলফে সানি শায়েখ আহমদ ফারূকী সেরহিন্দী (রঃ) এবং হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ্ (রঃ) এর আরওয়াহ্ পাকে পৌঁছাইয়া দাও। কাদেরিয়া, চিশ্‌তিয়া, নকশ্‌বন্দিয়া, মোজাদ্দেদিয়া ও অন্যান্য তরিকায় যতো পীর অলি আল্লাহ্ গুজরে গিয়েছেন প্রত্যেকের আরওয়াহ্ পাকে পৌঁছাইয়া দাও ইয়া আল্লাহ্। হজরত হাজী রিয়াসত আলী খান শাহজানপুরী (রঃ), হজরত বর ফকিরে আহমদ এছরার আলী ওরফে আমিনউদ্দিন সাহেব হানফি (রঃ) এর আরওয়াহ্ পাকে পৌঁছাইয়া দাও ইয়া আল্লাহ্। ইয়া আল্লাহ্ তাদের সবারই দোয়ার বরকতে ও অসিলায় তুমি আমাদের দোয়াকে কবুল করো কবুল করো। ইয়া আল্লাহ্। আমাদেরকে গাফেল রেখো না তোমার বন্দেগী হইতে— গাফেল রেখো না গাফেল রেখো না। ইয়া আল্লাহ্, দেশবাসীকে হেদায়েত করো, প্রতিবেশীকে হেদায়েত করো। তোমার সত্য দ্বীনকে তুমি প্রসার করে দাও, প্রসার করে দাও। হক প্রতিষ্ঠিত কর, বাতেল ধ্বংস করে দাও, ধ্বংস করে দাও।.....

হজরতের সঙ্গে সিক্ত নয়নে সবাই শেষ করেন মোনাজাত। তোবারক বিতরণের পর ফজরের আজান পড়ে। আবার চেনা মোয়াজ্জেনের কণ্ঠে ঊষার অপ্রতিরোধ্য সূর্য-সম্ভাবনার মতো আনন্দ-মধুর আওয়াজ ওঠে, 'আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার।'

ফজরের নামাজ বাদ আবার শুরু হয়ে যায় মোরাকাবা। মোরাকাবা মহফিলের পর দূরবর্তী আশেকবৃন্দ চলে যেতে থাকেন একে একে। মহফিল ভেঙে যায়। পরে থাকে শূন্য প্যাণ্ডেল বিহঙ্গবিহীন শূন্য পিঞ্জরের মতো।

ধীরে ধীরে বেলা বেড়ে যায়। সম্বিৎ ফিরে পান হজরত। প্যাণ্ডেল খুলে ফেলতে শুরু করেন মজুরদের সাথে। দড়ির শক্ত বাঁধন খুলে দেন একট একটা করে।

একজন বলেন, 'আব্বা, সবাই চলে গেলো। মনটা যেনো কেমন করছে।'

কথা শুনে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে তিনি বলেন, 'তোমার শুধু মনটা কেমন করছে? আর আমার যে কি হচ্ছে। সবাই চলি গেলো। আর কবে দেখা হবে কে জানে।'

বিরহের নিঃশব্দ বিলাপ কেঁদে ওঠে গোলপাতা ছাওয়া কুটিরে, মাটির খানকায়। ফাঁকা সমস্ত কিছু। যেনো হজরতের হৃদয়ের ব্যথার ভারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে সবকিছু। গেটের ধারের দুই কামিনী ফুলের গাছ। বাইরে যাবার গেটের পাশের গোলাপ গাছ দুটো— একটা লাল। একটা শাদা। সববিছু কেমন ম্লান! মুখরিত প্রেমের মহফিল স্তব্ধ হয়ে গেছে।

আবার সফরে বেরিয়ে পড়েন হজরত। কিছুদিন বাড়ীতে, কিছুদিন বাইরে এভাবেই দিন কাটতে থাকে তাঁর। অবসর নেই। অবসর নিবার সময় নেই।

জীবনকাল সামান্য। কখন আল্লাহ্‌র দরবার থেকে ডাক এসে পড়বে। যে কটা দিন হায়াত আছে, আল্লাহ্‌পাকের দ্বীন সমুন্নত করবার প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত রাখা উচিত। না হলে কি জবাব দিবেন তিনি আল্লাহ্‌র কাছে।

দেশের বিভিন্ন স্থানে হজরত তৈরী করেছেন ইশকে ইলাহীর মনোহর বাগান। বপন করেছেন পুষ্পের গাছ। সেগুলোর কোনো কোনোটি পুষ্পসম্ভবা। যত্ন নেয়া একান্ত প্রয়োজন বাগানগুলোর। সহবতের উপরই নির্ভর করে এই তরিকার কামিয়াবি। তাই তিনি ঘরে বসে থাকতে পারেন না। বেরিয়ে পড়েন সফরে।

অনেকেই সাতক্ষীরায় এসে দেখা সাক্ষাৎ করে যান। তবুও সবাইতো আর আসতে পারে না। বেশীর ভাগই দরিদ্র মানুষ। মোর্শেদ দর্শনের আকাংখা কার না হয়? কিন্তু সাধ থাকলে কি হবে, সাধ্য কোথায়? তাই তিনি বেরিয়ে পড়েন ঘর থেকে। নিজেই যান পেয়ারা ফরজন্দগণের অন্তর পরিতৃপ্ত করবার জন্য— রূহানী ফায়দা বিতরণের জন্য।

চিঠিপত্রেও যোগাযোগ হয় সবার সঙ্গে নিয়মিত। কেউ হয়তো চিঠি লেখেন, অন্তর বেচয়েন হয়েছে তাঁর মোর্শেদ দর্শনের জন্য। কিন্তু পাথেয় নেই। হজরত তাকে মনি অর্ডার যোগে টাকা পাঠিয়ে দেন। তিনি সাতক্ষীরা এসে দেখে যান প্রিয় মোর্শেদকে। কিন্তু সবারই প্রতি তো এরকম করা সম্ভব হয় না। হজরতেরও যে অঢেল সম্পদ নেই।

এর উপরে আছে নানা জনের নানা অসুবিধা। কেউ বেকার। কর্মসংস্থান নেই কারো। কেউ কর্মচ্যুত। উপায়হীন। তাঁদেরকে আশ্রয় দিতে হয়। সুযোগ সুবিধা না পাওয়া পর্যন্ত খানকায় অবস্থান করেন তাঁরা।

ওদিকে দাওয়াখানা আছে। কলমের চারা লাগানো আছে। এতো ব্যস্ততার মধ্যেও দ্বীনের খাতিরে কিছুদিন পরপরই বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়তে হয় হজরতকে।

বিভিন্ন স্থানে মহফিলের ব্যবস্থা করেন হজরত। সঙ্গে থাকেন দুই একজন আলেম বক্তা। স্থানীয় আলেম মুরিদগণও সহযোগিতা করেন তাকে। বিভিন্ন আলোচনা মহফিলের মাধ্যমে তিনি ডাক দিতে থাকেন মানুষকে। ডাক দিতে থাকেন চিরঅমলিন ইশকে ইলাহির সুবাসিত কাননের দিকে।

কখনো কখনো একাই বেরিয়ে পড়েন। বক্তৃতা করার অভ্যাস নেই বলে আলোচনা মহফিল করতে পারেন না। তবুও লোকজন আসে। বায়াত গ্রহণ করে তাঁর কাছে। মুখে মুখে বিভিন্ন স্থানে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া অনেকে তাঁর চেহারা মোবারকের দিকে দেখেই আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। বিনা বাক্যব্যয়ে বাড়িয়ে দেন হাত। দাখেল হন হজরতের কাফেলায়।

এরকমই হয়। আউলিয়া সম্প্রদায় তো ফুলেরই মতো। যেখানেই থাকেন না কেনো তাঁরা, পুষ্পের মতো নিরন্তর ছড়িয়ে যান পবিত্র প্রেমের সুরভি। তিনি নিজেও কখনো কখনো বলতেন একথা, 'আমরা হলাম আল্লাহ্‌র বাগানের ফুল। ফুল ফুটলে বাগানের মালিক কতো খুশী হন। মালিকতো চান তাঁর বাগান ফুলে ফুলে ভরে যাক।'

দুই এক সময় এরকমও দেখা যায়, কোনো মসজিদে নামাজ আদায় করার পর তিনি ঘুরে বসলে আপনা আপনি চেনা অচেনা মুসল্লি তাঁকে ঘিরে বসে পড়েন। এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন তাঁর নূরানী চেহারার দিকে। পুষ্পের মতো পবিত্র তাঁর মুখাবয়বের দিকে। হজরত আড়ষ্টতা কাটিয়ে তাঁদের উদ্দেশ্যে রাখেন তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য অত্যন্ত শাদামাটা ভাষায়। কিন্তু ঐ কয়েকটা কথার মধ্যে কি থাকে কে জানে। শ্রোতাগণ মুগ্ধ হয়ে শোনেন। মানুষের কথা এতো সুন্দর হয়? কতো তেজদীপ্ত বক্তার বলিষ্ঠ বক্তব্যের তেজস্বিতাও ম্লান হয়ে যায় তাঁর সাধারণ কথার স্বাভাবিক শক্তির কাছে।

হজরত বলেন, 'যখন আমরা স্বীকার করলুম লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্— এই লা ইলাহাটা কে? জীবজগতসমূহ বৃক্ষরাজিসমূহ পাহাড় পর্বত গ্রহ নক্ষত্র ইহারা— কেহ আল্লাহ্ নয়— আল্লাহ্ই আল্লাহ্। তারপর যখন আমরা বললুম মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্— তখনই আমাদের উপরে এলো শরীয়ত। শরীয়তের প্রধান ভিত্তি নামাজ। এই নামাজে আমরা যখন দাঁড়াই তখন আমরা বলি, হে আল্লাহ্ আমি তোমার দিকে মুখ ফিরোচ্ছি; নিশ্চয়ই আমরা মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নই। তারপর যখন নামাজ আদায় করলুম তখন নামাজের মধ্যে বউ ছেলে মেয়ে, বাজার ঘাট কতোকিছু এসে হাজির হয়। এ রকম নামাজ যার মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রতি হুজুরী কলব থাকে না— আল্লাহ্‌পাক ফেরেশ্‌তাদের বলেন, ছুঁড়ে মারো ঐ নামাজীর মুখে নামাজ, যে নামাজে দাঁড়িয়ে গায়েরুল্লাহর ইবাদত করে। এই হুজুরী কলবের জন্য জেন্দা দেল হওয়া দরকার। পীর ধরা প্রয়োজন। আল্লাহ্ বলেন, যে আমার দিকে এক বিঘত এগোয়, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যে আমার দিকে বাতাসের মতো আসে, আমি তার দিকে বিদ্যুতের মতো যাই। এরকম করতে করতে এরকম হয়ি যায়— আমি হই তার মিশ্রি সে হয় আমার মিষ্টি, আমি হই তার গোলাপ ফুল সে হয় আমার খুশবু। নাহনু আকরাবো ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারিদ— আমি তোমার রগে জান অপেক্ষ নিকটে।'

মানুষ দুনিয়ায় আসে। আবার চলে যায়। যেতে হয় সবাইকে। মানুষের নিজস্ব জ্ঞান, তার ফিরে যাবার পথের পরিচিতি উদ্ধার করতে সক্ষম নয়। তাই মেহেরবান আল্লাহ্তায়ালাই তাঁর নির্বাচিত বান্দাগণের মাধ্যমে বার বার জানিয়ে দেন পথের সন্ধান। সোজা পথ। সে পথে জটিলতা নেই। অস্পষ্টতা নেই। নেই কোনো বৃথা আড়ম্বর। মানুষের চিরকালের মুক্তি— তার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থেকে, বুদ্ধির আড়ষ্টতা থেকে মুক্তি পেতে হলে তাকে তাঁর সৃষ্টিকর্তার কথাই নির্বিবাদে মেনে নিতে হবে। করতে হবে পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

কারণ, মানুষ সসীম। তাই তার জ্ঞান বুদ্ধিও সসীম। সে যদি নিজস্ব উদ্ভাবিত প্রক্রিয়ার মধ্যে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থেকে, বুদ্ধির অস্পষ্টতা থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টায় মেতে থাকে, তবে সে সীমার মধ্যেই ঘুরপাক খাবে চিরকাল। এভাবেই সে ভুলে যেতে থাকবে ক্রমে ক্রমে মুক্তির— স্বাধীনতার সংজ্ঞা। নিজস্ব জ্ঞানের সীমায় বিচরণ করতে করতে, নিজস্ব বুদ্ধির অনুশীলন করতে করতে বার বার শান দেয়া চকচকে অস্ত্রের দ্যুতি দেখার মতো মনে করবে মুক্তির সনদ বুঝি লাভ হয়েছে তার। কিন্তু রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রসনায় যেমন মিষ্ট বস্তু তিক্ত বলে অনুভূত হয়, তেমনি অসীমের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত থাকায় সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তির আস্বাদের আহবানও তার কাছে মনে হবে তিক্ত। মনে হবে দয়াময় প্রভু কর্তৃক নির্দেশিত বিধান যাকে শরীয়ত বলা হয়, তা হচ্ছে কারাগার। তাদের নিকট শরীয়ত প্রতিপালনের যৌক্তিকতার পক্ষে হাজারো যুক্তি প্রমাণ উত্থাপন করা হলেও তা তাদের মনোপুত হবে না মোটেও।। কারণ, তাদের প্রতি যে বিষয়ের আহবান জানানো হচ্ছে, তা তাদের বিকৃত অনুভূতির বিপরীত।' আল্লাহ্পাক যেমন বলেন, 'কুলুবুহুম মারাদুন'। 'তাদের অন্তর রোগগ্রস্ত।' তাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আছে, জ্ঞানের ঝলকানি আছে, স্বচ্ছতা নেই। অস্বচ্ছ অশুদ্ধ অন্তঃকরণই ইমান অর্জনের পথে প্রধান বাধা। তাঁদের জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্য, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ফুলদানীতে রাখা বৃন্তচ্যুত পুষ্পের মতো। আপাতঃ সতেজ হলেও অস্থায়ী। অপর দিকে আল্লাহ্পাকের প্রেরিত বান্দাগণের অনুসারীগণ প্রকৃত পথের অনুসরণের কারণে অসীমের রঙে রঞ্জিত হতে সক্ষম হন। সত্তার কারাগার থেকে তারা মুক্ত হতে সক্ষম হন বলেই চিরমুক্তির সনদও লাভ করেন। ফলে তাঁদের জ্ঞানও সীমাবদ্ধতা থেকে এবং বুদ্ধি আড়ষ্টতা থেকে মুক্ত হয়। এটিই হচ্ছে মানবতা বিকাশের পথ। এ পথেই প্রবেশ

করা যায় মুক্ত মানবতার সুবাসিত কাননে। এই পথ পরিহারকরীরা যতো বড় দার্শনিকই হন আর যতো বড় বুদ্ধিজীবীই হন না কেনো, ভ্রান্তির মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জন তাদের পরিণতি। তাঁদের বাক্য 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব' সত্য বটে। কিন্তু মুক্তির পথের সন্ধান তাদের জানা নেই। তাদের আকাঙ্খিত 'বুদ্ধির মুক্তি' আছে তাঁদের প্রভুর কাছে, যাঁর অমোঘ বাণী এরকম, 'সিবগাতুল্লাহ্ ওয়া মান আহসানু মিনাল্লহি সিবগাহ্' (তোমরা আল্লাহ্পাকের রঙে রঞ্জিত হও। রঙে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর)। হে আদম সন্তান, তোমরা যদি আল্লাহ্পাকের রঙে রঞ্জিত না হও; তবে তোমরা বুদ্ধি জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার প্রাচীর অতিক্রম করতে সক্ষম হবে কি করে? অসীম আল্লাহ্র রঙে রঞ্জিত হলেই কেবল তোমার সত্তা, তোমার জ্ঞান, তোমার বুদ্ধি আড়ষ্টতা থেকে— সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হতে পারে। অন্য আর কোনো ভাবেই তা সম্ভব নয়। যাঁরা আল্লাহ্পাকের রঙে রঞ্জিত হবার পথের নিরলস সাধক তারাই মুক্ত— মৃত্যু থেকে, ধ্বংস থেকে, কাল থেকে। তাঁরাই বুদ্ধিমান যদিও বুদ্ধি তাদের জীবিকা নয়, তাঁরাই দার্শনিক যদিও দর্শনচর্চা তাদের উদ্দেশ্য নয়। তাঁরাই জ্ঞানী যদিও বিকৃতবুদ্ধি লোক সমাজে জ্ঞানী বলে তারা স্বীকৃত নন।

আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসূলের পথে যারা চলেন, তাঁদের কাছেই রয়েছে প্রকৃত মানবতা। প্রেম। সোজা পথের পরিচিতি। চিরন্তন মুক্তির নির্ভুল দিক নির্দেশনা।

আল্লাহ্পাক তাঁর রসূলকে জানিয়েছেন, 'কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লহা ফাত্তাবিউনি ইউহ্বিব কুমুল্লাহ্' (ঘোষণা করে দাও হে রসূল, যদি তোমরা আল্লহ্পাকের প্রেমে রঞ্জিত হতে চাও তবে আমার অনুসরণ করো। আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে ভালবাসেন)। আল্লাহ্পাকের এই ঘোষণায় পরিষ্কার জানিয়ে দেয়া হয়েছে— আল্লাহ্প্রাপ্তির পথ, আল্লাহ্র রঙে রঞ্জিত হবার পথ, নিজের সত্তার কারাগার থেকে, জ্ঞানবুদ্ধির সীমাবদ্ধতা ও আড়ষ্টতা থেকে মুক্তির পথ রসূলের (সঃ) অনুসরণের মধ্যেই নিহিত। অন্য কোনোকিছুতে নয়।

এই পথের মর্ম সুফী সাধকদের মতো এমন করে কেউই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। তাঁরা জানেন, প্রত্যেক জিনিসেরই দুইটি দিক আছে। একটা তার বাইরের আকৃতি আর একটা তার প্রকৃত তত্ত্ব। একটা সুরত আর একটা হকীকত। যে কোনো বস্তু লাভ করতে গেলে তার সুরত ও হকীকত দুইই লাভ করতে হয়। নতুবা তা পূর্ণরূপে লাভ করা সম্ভব নয়। তাঁরা সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন নন যে, শুধুমাত্র বাহ্যিক আকৃতিতেই সন্তুষ্ট থাকবেন। আবার বিকৃত দৃষ্টিধারীও নন যে, শুধু হকীকতের নামে আকৃতিকে পরিত্যাগ করবার চিন্তা করবেন। যেরূপ ভণ্ড সুফী দরবেশদের ধারণা।

তাঁরা ভালোভাবেই বুঝেছেন আল্লাহ্ প্রেমের প্রবল উচ্ছ্বাসকে শরীয়তের বাঁধ দ্বারা আটকে রাখতে হবে আবে জমজমের মতো। যাতে দিশাহীন তোয়প্রবাহ

ক্ষতিকারক সয়লাবের শিকার না হতে পারে। তাইতো তাঁরা দেহ ও মনের সুসামঞ্জস্য ইবাদতের অভিলাষী। তাঁরা জানেন, সুরতে শরীয়ত এবং হকীকতে শরীয়ত পরস্পরের পরিপূরক।

পিতা মাতা শিশু-সন্তানদেরকে মলমূত্রের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রাখেন। ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করেন তাঁদের ময়লা আবর্জনা। তাঁরা তাঁদের সন্তান-সন্ততিকে ভালবাসেন বলেই তো এরকম করতে সক্ষম হন। এভাবেই তাঁরা মানুষ করে গড়ে তোলেন বুকের ধন সন্তান-সন্ততিকে।

সন্তানের প্রতি পিতামাতার যে ভালোবাসা, তার চেয়ে অনেক বেশী ভালোবাসা থাকে নবীগণের তাঁদের নিজ নিজ উম্মতের প্রতি। শেষ নবী মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যেহেতু জ্বীন-ইনসান সকল সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শনের দায়িত্বপ্রাপ্ত, তাই মখলুকাতের প্রতি তাঁর ভালোবাসা আরও ব্যাপক। আরও গভীর। তাঁর প্রেম সমুদ্রের সীমা নেই, তল নেই। তাইতো তাঁর জানের দুশমন, দ্বীনের দুশমন আবু জেহেলের হেদায়েতের জন্য তাঁর মোবারক চোখ থেকে অশ্রু বর্ষিত হয়েছে। দুই হাত উত্তোলিত হয়েছে আল্লাহ্র সমীপে। তাইতো প্রস্তর বর্ষণকারী তায়েফবাসীর জন্যও তাঁর দোয়ার প্রস্রবণ জারী হয়েছে চিরপ্রবহমান নির্ঝরের মতো। তাইতো অহুদ প্রান্তরে অস্ত্রাঘাতকারীদের প্রতিও তাঁর মোবারক মুখে উচ্চারিত হয়েছে, 'ইয়া আল্লাহ্ আমার কওম অবুঝ। তুমি তাদের হেদায়েত করো।' আল্লাহ্পাক তাইতো তাঁকে মোবারকবাদ জানিয়েছেন এই বলে, 'অমা আরসালনাকা ইল্লা রহমাতাল্লিল আলামীন' (তুমি জগতসমূহের জন্য আমার রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছো)।

রসূল পাক (সঃ) এর পূর্ণ অনুসরণকারী ব্যক্তির মধ্যেও প্রতিবিম্বিত হয় তাঁরই মতো মানবপ্রেম। সুন্নতের নূরে সমুজ্জ্বল এ ধরনের ব্যক্তিও তাঁর প্রেম ভালোবাসার অপ্রতিরোধ্য নূরানিয়াতের মাধ্যমে মানুষের কলবে জমে থাকা অপবিত্রতা অপসারণ করেন। নিজের বুকের সম্পদ শিশুসন্তানের মতোই তাঁদের ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করে তাঁদের রূহানী সত্তাকে নিয়ে যান পরিণত অবস্থায়। তাঁরা নফস ও শয়তান প্রভাবিত মানব কাননে বপন করেন আল্লাহ্ প্রেমের পুষ্পসম্ভবা বৃক্ষ। তারপর যত্ন নেন নিয়মিত। আগাছা পরিষ্কার করেন। নিয়মিত পানি সিঞ্চন করেন। রক্ষা করেন সে সমস্তকে শত্রুর আক্রমণ থেকে। তারপর যখন পুষ্পে পুষ্পে ভরে যায় ডালপালা, তখন প্রাণভরে শোকরানা জানান আল্লাহ্পাকের দরবারে। সুফিয়ানে কেরামের মধ্যে এরকম ব্যক্তিত্ব খুব কমই দেখা যায়। এধরনের পীর বুজুর্গকে হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি (রঃ) অভিহিত করেছেন 'তরবিয়ত করনেওয়ালা পীর' বলে। অন্যান্য কামেল পীরের কার্যকলাপ ভিন্ন। তাঁদেরকে মোজাদ্দেদে আলফে সানি (রঃ) অভিহিত করেছেন 'শিক্ষাদাতা পীর' বলে।

হজরত হাকিম আবদুল হাকিম (রঃ) ছিলেন সেই ধরনের বিরল বুজুর্গ, যাঁদেরকে তরবিয়তকারী পীর বলা হয়। সূর্যের আলোর মতো, বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিধারার মতো বিরামহীনভাবে বর্ষিত হয় তাঁর নেসবতের ফয়েজ ছোট বড় সবার প্রতি। 'এ যে আল্লাহ্পাকের নিছক অনুগ্রহ। তিনি যাঁকে খুশী তাঁকেই এই নেয়ামত দান করেন। তিনি অতি উচ্চ অনুগ্রহকারী।' এই বাক্যেরই অর্থ সহজভাবে প্রকাশিত হয় তাঁর মোবারক জবানে, 'আল্লাহ্পাক আমাকে ফাও দিয়েছেন। আমিও ফাও বিলিয়ে দিয়ে যাবো।'

হজরতের চেহারা মোবারক ছিলো অত্যন্ত সুন্দর। মধ্যমাকৃতির সুন্দর সুঠাম স্বাস্থ্য। তিনি খুব বেশী লম্বাও ছিলেন না। আবার খাটোও ছিলেন না। চেহারায় ছিলো গোলাপী নূরের আভা। কখনো কখনো একবারে লাল টকটকে হতো মুখের রং। কখনো শাদাটে। আবার কখনো সুরমা রং।

মুরিদগণের সঙ্গে কথা বলার সময় কখনো কখনো ছোট শিশুদের মতো কথা বলে যেতেন একটানা। কখনো মৃদু মধুর কথালাপে মেতে উঠতেন আবার কখনো হয়ে যেতেন গম্ভীর। মৌন পর্বতের মতো। নিসর্গের নীরব বনরাজীর মতো। কখনো চোখে মুখে ফুটে উঠতো ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা। তখন চেনা জানা লোকেরাও ভীত বিহবল হয়ে পড়তেন। কখনো কখনো এমনও হাল হতো— অতি চেনা মুরিদ যাঁদেরকে সব সময় তিনি 'তুমি' বলে সম্বোধন করতেন, তাঁদেরকেও 'আপনি' বলতে শুরু করতেন।

তাঁর ইবাদত বন্দেগীও ছিলো অত্যন্ত শাদামাটা ধরনের। কোনো আড়ম্বর ছিলো না তাতে। নামাজ পড়তে দেখলে মনে হতো, অদৃশ্য কোনো ইশারায় তিনি যেনো হয়ে গেছেন নরোম মোমের মতো। আপনাআপনি যেনো তার শরীর রুকু অবস্থায়, আবার সেজদা অবস্থায় সমর্পিত হচ্ছে। নিজের ইচ্ছা চেষ্টার কোনো অস্তিত্বই যেনো নেই। মনে হতো সেই কথা 'ইন্নাস্ সলাতি ওয়া নুসূকি ওয়া মাহ্ইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' (আমার সালাত, আমার সৎকর্মসমূহ, আমার জীবন এবং মৃত্যু সমস্ত কিছুই বিশ্বসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য)।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি (রঃ) এরশাদ করেছেন, 'পূর্ণ নামাজী নামাজের মধ্যে নিজেকে মুসা (আঃ) এর বৃক্ষের মতো প্রাপ্ত হয়। নিজেকে মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না নিজের কাছে।'

হজরত ছিলেন মাবুদের নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী এক মহান অলি আল্লাহ্। তাই তাঁর নামাজও ছিল কামেল নামাজ। আবদিয়াতের মাকাম প্রাপ্ত ব্যক্তির নামাজ এরকমই হয়।

হজরতের গভীর রাতের ইবাদত ছিল আরো গোপন। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি ছিলেন একেবারে সাধারণ মানুষের মতো। সাধারণ নামাজীর মতো।

দিনের বেলা প্রায় সারাক্ষণ ওষুধ তৈরী, দাওয়াখানায় রুগী দেখা, কলমের চারা লাগনো, মজুরদের সঙ্গে এক সাথে কাজ করা বা বাজার ঘাট করা— কোনো অবস্থাতেই জিকির থেকে গাফেল থাকতেন না তিনি। 'তাঁহারা এমন এক সম্প্রদায় যাদেরকে ক্রয় বিক্রয় ব্যবসা বাণিজ্য আল্লাহ্পাকের স্মরণ থেকে গাফেল রাখতে পারেনা'— আল্লাহ্পাকের এই কালামের পূর্ণ অনুকূল অবস্থা ছিলো হজরতের। নকশ্বন্দিয়া বুজুর্গগণ যাকে ইয়াদ দাশত্ (বিরতীহীন স্মরণ) বলে অভিহিত করেন তিনি ছিলেন সেরকমই।

কখনো হঠাৎ কাউকে চোখ বন্ধ করে গভীরভাবে ধ্যানমগ্ন দেখলে বলে উঠতেন, 'এরকম রেয়াজত সব সময় করতি পারলি কাজ হয়। তা চোখ বন্ধ করবার দরকার তো হয় না। আমাকে কখনো চোখ বন্ধ করতি দেখিছ।'

হজরতের এই কথায় ছিলো হজরত মোজাদ্দেদ আলফে সানি (রঃ) এর কথার সঠিক প্রতিধ্বনি। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি (রঃ) বলেছেন, 'জানা আবশ্যক যে খেলাওয়াৎ দর আঞ্জুমান ঐ সময় হয়, বলা হইয়া থাকে যখন (আত্মিক) নির্জন গৃহের যাবতীয় দরোজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং গবাক্ষগুলি রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়, অর্থাৎ জনতার কোলাহলের মধ্যেও যেনো সে কাহারও প্রতি লক্ষ্য না করে এবং কাহারও সম্বোধিত না হয়। এই কথার অর্থ এই নয় যে, চক্ষু বন্ধ করে এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে ইচ্ছাকৃতভাবে অকর্মণ্য করিয়া রাখে। হে ভ্রাতঃ এইরূপ কৌশল ও আড়ম্বর প্রথমাবস্থায় এবং মধ্যবর্তী অবস্থায় প্রয়োজন। শেষ অবস্থায় উহার কোনোই প্রয়োজন হয় না। তখন বিশৃঙ্খল পরিবেশেও সে নির্বিকার এবং অমনোযোগিতার মধ্যেও চৈতন্যময় থাকিতে সক্ষম হয়। .... '(সাইয়েদ হোসেন মানিকপুরীর নিকট লিখিত। মকতুবাত শরীফ, প্রথম খণ্ড)।

হজরত শাদা পোশাক পছন্দ করতেন। শাদা ছাড়া অন্য রঙের পোশাক তাঁকে কোনো সময়ই পরতে দেখা যেতো না। পাঞ্জাবী হাঁটুর দুইচার আঙ্গুল নীচ পর্যন্ত ঝুলে থাকতো। বার্ষিক মহফিল, শবেবরাত বা অন্য কোনো অনুষ্ঠানে কোনো কোনো সময় আরবী লম্বা পাঞ্জাবীও পরতেন টাখনুর কিছু উপর পর্যন্ত। লুঙ্গি পরতেন। হিন্দুস্তান সফরে গেলে সাধারণতঃ সালোয়ার পরিধান করতেন। প্রথমদিকে শেরোআনী পরতেন। পরের দিকে আর পরতেন না। শীতকালে পশমী চাদর পরিধান করতেন। দুইটি চাদর ছিলো তাঁর। একটি ঘিয়ে রঙের। আর একটি সবুজ।

হজরত শাদা পাগড়ী পরিধান করতেন। মুরিদগণকেও নামাজের সময় পাগড়ী ব্যবহার করতে বলতেন। বিশেষ করে ফরজ নামাজ আদায় করার সময়। তিনি বলতেন, 'পাগড়ী ছাড়া ফরজ নামাজ দুরস্ত হয় না।' হজরত পাগড়ীর শামা রাখতেন

ছোট। স্কন্ধের কিছু নিচে পর্যন্ত তা ঝুলে থাকতো। একটি বড় পাগড়ীও ছিলো তাঁর। প্রথম দিকে জুমআর নামাজের সময় কখনো কখনো তিনি তা ব্যবহার করতেন।

কস্তুরী আতর ছিলো তাঁর প্রিয় সুগন্ধি। সাধারণতঃ প্রতি ওয়াক্ত নামাজের সময় একামত শুরু হলে তিনি পকেট থেকে আতর বের করে লাগাতেন। তখন সমস্ত জামাত ভরে উঠতো কস্তুরীর সুগন্ধে। পরের দিকে পছন্দনীয় আতর পাওয়া যেতোনা বলে তিনি আতর ব্যবহার প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। অনেকে অনেক রকম আতর হাদিয়া প্রদান করতেন তাকে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে একবার মাত্র ব্যবহার করতেন সে সমস্ত। পছন্দ হতো না বলে দ্বিতীয়বার আর ব্যবহার করতেন না।

তিনি উৎকৃষ্ট খাবার পছন্দ করতেন। তার গৃহে বেশীর ভাগ সময় উৎকৃষ্ট খানারই এন্তেজাম হতো। হজরত নকশ্‌বন্দ (রঃ) বলেছেন, 'চর্বিদার খানা খাও এবং জিকির করো।'

পূর্ববর্তী জামানার বুজুর্গগণ মনে করতেন, কম এবং অতি সাধারণ আহার এবং কম নিদ্রায় অভ্যস্ত না হলে মারেফতের সাধনায় সফল হওয়া যায় না। এজন্যই সারা রাত্রি জাগ্রত অবস্থায় ইবাদতে রত থাকা এবং দিনের পর দিন রোজা রাখা ছিলো ঐ সমস্ত হজরতগণের সাধনার প্রধান অবলম্বন। নকশ্‌বন্দী বুজুর্গগণ সে পথে যাননি। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, অল্প আহার এবং সারা রাত জাগ্রত থাকার মধ্যে কোনো কামালত নেই। কামালত অর্জন রসূলেপাক (সঃ) এর অনুসরণের মধ্যে নিহিত। সব ব্যাপারে মধ্যবর্তী অবস্থা গ্রহণ করাই রসূলেপাক (সঃ) এর পবিত্র আদত ছিলো।

হজরত যেমন উৎকৃষ্ট খানা নিজে খেতে পছন্দ করতেন, তেমনি মেহেমানদের দস্তরখানাতে উৎকৃষ্ট আহার পরিবেশন করতেন। মানুষকে খাওয়াতে তিনি পছন্দ করতেন খুব। বলতেন, 'ভালো খাওয়াতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু পেট কিছু খালি রেখে খাওয়া শেষ করা উচিত। এরকম করা সুন্নত।'

হজরতের রান্না ব্যঞ্জন ছিলো খুবই সুস্বাদু এবং ফয়েজ বরকতে ভরা। দূরের মেহমানদের বিদায়ের সময় তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। রাত দুটো তিনটের সময় বাস ধরবার জন্য যাঁদেরকে যেতে হতো, তাঁরা যাবার সময় হজরতের ঘরের সামনে এসে ইতস্ততঃ করতেন। এসময় হজরতের বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটানো ঠিক হবে কিনা— এরকম চিন্তা করতেন কেউ কেউ। ঠিক তখনই দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসতেন তিনি। বলতেন 'তা চলি যাচ্ছেন? যান। খবরদার খবরদার চিঠিপত্র দিতে ভোলবেন না কিন্তু।'

খুব ভোরে যারা রওয়ানা দিতেন, তাঁদেরকে ফজরের নামাজের পর হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে দিতেন বড় রাস্তা পর্যন্ত। অত সকালে বাড়ীতে নাস্তা বানানো সম্ভব হতো না বলে তাঁরই এক মুরিদানের রেষ্টুরেন্টে নাস্তা খাওয়ানোর পর বিদায় দিতেন মেহমানদেরকে।

হজরতের কুটিরের বাইরে বারান্দায় সব সময় একটা পিতলের বড় বদনায় অজুর পানি থাকতো। সেখানে বসেই অজু করতেন তিনি বেশীর ভাগসময়।

মাটির খানকায় বসতেন মাগরিবের সময় থেকে। মাগরিব বাদ মুরিদগণকে নিয়ে মোরাকায় বসতেন কিছু সময়। কখনো কখনো এশার নামাজের পর চিঠি পত্রের জবাব দেওয়ার জন্য তাঁকে খানকায় অবস্থান করতে হতো। এর মধ্যে বাড়ীর ভিতর থেকে কিছু সময়ের জন্য ঘুরে আসতেন প্রয়োজন হলে।

হজরতের খানকা ছিলো নকশ্‌বন্দি বজুর্গদের খানকার মতোই নীরব। নীরবতার মধ্যেই কখনো কখনো কেটে যেতো দীর্ঘ সময়। কখনো কখনো বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা উঠতো।

বাজার ঘাট, ফলমূল এসব সাধারণ বিষয়েও কথা উঠতো কখনো কখনো। রসূল পাক (সঃ) এর দরবার সম্পর্কেও হাদিস শরীফে এসেছে যে, সব সময় দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ কথাই হতো না সেখানে। দুনিয়ার কথাও উঠতো।

হজরতের দরবারও সেরকমই ছিলো। কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ই তিনি মুরিদগণকে নিয়ে নীরবে সময় অতিবাহিত করতেন। নকশ্‌বন্দি বুজুর্গগণ বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের মৌনতা দ্বারা উপকৃত হলো না, সে আমাদের কথা দ্বারা কি ফায়দা লাভ করবে?' মূলতঃ মৌনতার মাধ্যমেই এই উচ্চ সিলসিলার ফায়দা আদান প্রদান হয়।

কারো দোষ ত্রুটি সম্পর্কে আলোচনা উঠলে হজরত রাগান্বিত হতেন। বলতেন, 'দোয়া করতি পারো না তার জন্য।'

হজরত কাউকে নসিহত করতে চাইলে সাধারণতঃ সরাসরি বলতেন না। পরোক্ষভাবে বলতেন। যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বুঝতে পারে এবং লজ্জিত না হয়। কেউ নিজের চরিত্র স্বভাব সংশোধনের প্রতি উদাসীন থাকা সত্ত্বেও পোশাক আশাকের ক্ষেত্রে আড়ম্বর করলে তিনি সবার দিকে লক্ষ্য করেই বলতেন, 'শুধু লম্বা জামা কাপড় পরলে, দাড়ি রাখলে সুন্নত হয় না। আখলাকে রসূল ধরার চেষ্টা করেন।'

আবার কখনো সুন্নতি লেবাস পোশাক পরিধানের ব্যাপারে কাউকে উদাসীন দেখলে বলতেন, 'যে, যে জাতিকে অনুসরণ করে, সে সেই দলভুক্ত।' হজরতের এই কথায় তাহজীব তামুদ্দুনের গুরুত্ব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠতো।

সাধারণতঃ নসিহত প্রদানের ব্যাপারে তিনি বাড়াবাড়ি করতেন না। মোর্শেদের সঙ্গে খাঁটি মহব্বতের বন্ধন মজবুত করবার জন্য তাগিদ দিতেন। নিজেও কথা বার্তা ব্যবহারে এমন ভাব ফুটিয়ে তুলতেন যাতে মুরিদগণ বুঝতে বাধ্য হতেন যে, এরূপ আপনজন তাঁদের আর কেউ নেই। মহব্বতের প্রভাবে অতি দ্রুত বিভিন্ন বদ অভ্যাসে আক্রান্ত মুরিদগণ মোর্শেদের রঙে রঞ্জিত হতেন। তাঁদের চিন্তা চেতনায় স্বভাবে চরিত্রে লেবাসে পোশাকে দেখা দিতো খাঁটি আশেকে মওলার নূরানী অভিব্যক্তি।

আলেমদের প্রতি তার ছিলো গভীর সম্মানবোধ। অনেক আলেমই বায়াত গ্রহণ করেছিলেন তাঁর কছে। কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া বেশীর ভাগই তাঁর

শিক্ষাধারার সঙ্গে— তিনি যেরূপ চাইতেন, সে রকম সম্পর্ক রাখতে সক্ষম হননি। তিনি তবুও আশা করতেন। তাগিদ দিতেন। বলতেন, 'আপনারা ভালোভাবে কাজ করবেন। আপনাদের দ্বারা দ্বীনের প্রসার ঘটবে। আমার কতো আশা।'

ফেকাহ্‌র মাসলা মাসায়েল শিক্ষার জন্য মুরিদগণকে তাগিদ দিতেন তিনি। মকতুবাত শরীফ এবং মোজাদ্দেদে আলফে সানি (রঃ) এর জীবনী ইত্যাদি পড়বার জন্যও তাগিদ দিতেন সবাইকে।

ফেকাহ্‌র কেতাবের মধ্যে 'বেহেশতী জেওর'-কেই বর্তমান সময়ের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ফেকাহ্‌র গ্রন্থ বলে মনে করতেন। তাঁর স্নেহাস্পদ একজন মুরিদকে নিজ উদ্যোগে বিবাহ দিবার পর তিনি 'বেহেশতী জেওর' উপহার দিয়েছিলেন নবদম্পতির উদ্দেশ্যে এবং তাতে নিজ হাতে লিখে দিয়েছিলেন, 'তোমরা এই কেতাব পড়িবে ও আমল করার চেষ্ট করিবে।'

হানাফী মাজহাবের অনুসারী ছিলেন তিনি। বলতেন, 'আমরা হলুম হানাফী মজহাব, সুন্নত জামাত।'

কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো কুপমণ্ডুকতামুক্ত। বিভিন্ন স্থানে তিনি বলতেন, 'আমাদের সাম্যের অভাব। আল্লাহ্ আল্লাহ্‌র রসূলের পথে আমাদের দাওয়াত।' তাঁর এরকম মনোভাবের ফলে লা মজহাব (জমিয়তে আহলে হাদিস) সম্প্রদায়ের অনেক লোক তাঁর নিকট বায়াত গ্রহণ করেন। পরে হজরতের সহবতের প্রভাবে তাঁরা নিজেরাই ইমামে আজম (রঃ) এর একনিষ্ঠ ভক্ত ও অনুসারী হয়ে পড়েন।

শিয়া সম্প্রদায়েরও একটা দল তাঁর নিকট বায়াত হয়ে আহলে সুন্নত জামাত মতালম্বী হন। কিছু সংখ্যক হিন্দুও তাঁর নিকট বায়াত হয়ে প্রবেশ করেন ইসলামের চির সুবাসিত কাননে।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি (রঃ) এর প্রতি তাঁর ছিলো উন্মাতাল মহব্বত। তাঁর প্রসঙ্গে আলোচনা উঠলেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তেন তিনি। মোজাদ্দেদে আলফে সানি (রঃ) সম্পর্কে একই প্রসঙ্গ বার বার উচ্চারিত হলেও বিরক্তিকর মনে হতো না তাঁর কাছে। অনেক সময় তিনি নিজেও তাঁর সম্পর্কে নানা কথা বলতেন।

নিজ পীর ও পিতা হজরত আমিনউদ্দিন (রঃ) এর প্রতিও তাঁর ছিলো অসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। মাঝে মাঝে মুরিদগণের সামনে তাঁর স্মৃতিচারণ করতেন। বলতেন, 'তাঁর জীবন ছিলো একবারে শাদা মাটা। আমার মতোই শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে বাস করতে হতো তাঁকে।

বিনয় নম্রতা ছিলো হজরতের স্বভাবজাত। নিজের সম্পর্কে কখনো উচ্চ ধারণার আবিলতায় আক্রান্ত হতেন না তিনি। কোনো মুরিদ তার কাশফ্‌জাত হাল

বর্ণনা করতে গিয়ে যখন বলতেন 'আপনি এ জামানার মোজাদ্দেদ' তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে বলতেন, 'বাদ দাও দিন মোজাদ্দেদ। মোজাদ্দেদ দিয়ে কি আমি ধুয়ি খাবো। আসল কথা হলো কাজ।'

সত্যিই আল্লাহ্ পাকের দ্বীন বুলন্দ করবার প্রচেষ্ট ছিলো তাঁর জীবনের মূল ব্রত। এ কারণেই তিনি দ্বীনের জন্য সমস্ত কিছু কোরবান করবার ফিকিরে থাকতেন সব সময়।

হাসিদ শরীফে এসেছে, 'ওয়া ইজা রায়তালি তালেবান ফাকান লাহু খাদেমান' 'যদি আল্লাহ্র পথের কোনো পথিক পাও, তবে তার খাদেম হয়ো।' এই হাদিস অনুযায়ী তালেব মাওলাগণের খেদমতগার হিসাবেই নিজেকে সারাক্ষণ নিয়োজিত রাখতেন তিনি। মুরিদগণের নিকট লিখিত চিঠির শেষে লিখতেন, 'ইতি নগণ্য খাদেম হাকিম আবদুল হাকিম।'

সুলকের মঞ্জিল অতিক্রমণের সময় বিভিন্ন রকম কাশফ, এলহাম, নূর ইত্যাদি সালেকগণের লাভ হয়ে থাকে। এ সমস্ত বিষয় তরিকতপন্থী শিশুগণের খেলনা সদৃশ। মূল মকছুদ হচ্ছে, উদাহরণরহিত প্রকারবিহীন বেমেছাল জাত পাক। হজরত বাহাউদ্দিন নকশ্বন্দ (রঃ) বলেছেন, 'যাহা কিছু দর্শিত, শ্রুত ও অনুভূত হয় উহারা সব গায়ের আল্লাহ্।'

কোনো মুরিদ এ সমস্তের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যখন তার আত্মিক হাল সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে হজরতের নিকট বর্ণনা করতেন, তখন তিনি মূল বস্তুর প্রতি নজর ফেরানোর জন্য বলতেন, 'কি জানি কি যে হাল হয় তোমাদের— আমার তো জীবনে এরকম হাল হয়নি।'

রসূলেপাক (সঃ) এর দুই রকম অবস্থা হতো। কখনো নিজেকে নিকৃষ্ট দর্শনের হাল প্রবল হলে তিনি বিনয় সহকারে বলতেন, 'দেখো আমাকে মাত্তার পুত্র ইউনুছের (আঃ) চেয়ে উত্তম মনে করো না। কারণ তিনি যখন মাছের পেটে ছিলেন তখন আমার মেরাজ তাঁর মেরাজের চেয়ে উৎকৃষ্ট ছিলো না।' আবার গায়রতের হাল প্রবল হলে হজরত রসূলেপাক (সঃ) বলতেন, 'মুসা (আঃ)ও এ জামানায় জন্ম নিলে আমাকে অনুসরণ করা ছাড়া তাঁর উপায় থাকতো না।'

স্বভাবে বিনয় প্রবল থাকা সত্ত্বেও কখনো গায়রত হাল গালেব হয়ে গেলে হজরত হাকিম আবদুল হাকিম (রঃ) বলতেন, 'সারা ভারত ঘুরে আসি, কোথাও আমাকে মাথা নত করতে হয় না। একমাত্র সেরহিন্দ শরীফ ছাড়া।'

হজরত তাঁর প্রচারিত তরিকাকে 'খাস মোজাদ্দেদীয়া' নামে অভিহিত করতেন। সাধারণতঃ দেখা যায়, এই তরিকার বুজুর্গগণ এই তরিকাকে 'নকশ্বন্দিয়া মোজাদ্দেদীয়া' নামে অভিহিত করেন। কিন্তু তিনি যে কেনো এই তরিকাকে 'খাস মোজাদ্দেদীয়া' তরিকা বলতেন, তার বিভিন্ন রকম ব্যাখা হতে পারে। সম্ভবতঃ সিলসিলার ঊর্ধ্বতন পীরগণের মধ্যে হজরত হাজী রিয়াসত আলী খানের সময়

থেকে এই তরিকার নাম খাস মোজাদ্দেদীয়া বলে অভিহিত হয়ে আসছে। অথবা আরো কয়েক সিঁড়ি পূর্ব থেকেও হতে পারে।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি (রঃ) এরশাদ করেছেন, 'এই সিলসিলার ফয়েজ বরকত ততদিন পর্যন্ত জারী থাকবে যতদিন ইহা নতুনত্বের কলঙ্কে কলঙ্কিত না হয়। হয়তো হজরত হাকিম আবদুল হাকিম অবিকৃত এবং নতুনত্বের কালিমামুক্ত সিলাসিলার বিশেষ ধারার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন বলেই এই তরিকার নাম 'খাস মোজাদ্দেদীয়া' বলতেন। অথবা যা খাঁটি নকশ্‌বন্দিয়া তরিকা তাকেই মোজদ্দেদে আলফে সানি (রঃ) এর পরবর্তী সময় 'খাস মোজাদ্দেদীয়া' নামে অভিহিত হওয়াই সমীচীন বলে তিনি মনে করতেন। অথবা যেহেতু এই তরিকা হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি (রঃ) এর শ্রেষ্ঠ খলিফা, তাঁর তৃতীয় সাহেবজাদা হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম (রঃ) এর মাধ্যমে জারী হয়েছে, এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য এই তরিকাকে খাস মোজাদ্দেদীয়া তরিকা বলা হয়েছে। এই ব্যাখ্যাই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়ে থাকে।

উপরোক্ত কারণসমূহের যে কোনোটিই সঠিক হোক না কেনো, হজরত হাকিম আবদুল হাকিম যে তরিকা অনুযায়ী সালেকগণকে শিক্ষা দিতেন তা যে হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি (রঃ) এর তালিম প্রদানের খাস পদ্ধতি ছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর শিক্ষাধারার প্রত্যেক নির্দেশই মকতুবাত শরীফে বর্ণিত হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি (রঃ) এর নির্দেশের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ ছিলো। নকশ্‌বন্দিয়া তরিকার চার উসুল— হুঁশ হরদম, নজর বর কদম, সফর দর ওয়াতন এবং খেলাওয়াৎ দর আঞ্জুমান সম্পর্কে মোজাদ্দেদে আলফে সানি (রঃ) যেরূপ তাগিদ দিতেন তিনিও তেমনি, শুরু থেকেই তার নিজের ভাষায় মুরিদগণকে সহজভাবে বুঝিয়ে দিতেন সে সমস্ত কথা।

কেউ নতুন বায়াত গ্রহণ করলে তিনি তাঁকে সর্বক্ষণ খেয়াল রাখতে বলতেন মারেফাতের প্রথম মাকাম 'কলব' এর দিকে। তিনি কলব আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলতেন, এইখানে মারেফাতের প্রথম মাকাম কলব— এখানে খেয়াল রেখে মুখ নড়বে না, ঠোঁট নড়বে না, শরীর দুলবে না, কোনো শব্দ হবে না— চলাফেরা ওঠা বসা অজু বেঅজু, পাক নাপাক সব সময় মনে মনে আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির করবেন। আরো বলতেন, ভালোমতো কাজ করলে এক এক মাকাম চল্লিশ দিনের মধ্যে অতিক্রম করা যায়। তার চেয়ে আরো কম সময়েও করা যায়।

হজরতের উপরোক্ত নির্দেশের মধ্যে হুঁশ হরদম (সর্বদা জেকেরের প্রতি খেয়াল রাখা), এবং সফর দর ওয়াতন এর (নিজ গৃহে বা নিজ মাকামে পরিভ্রমণ) সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হয়ে যায়। নজর বর কদমের শিক্ষাও প্রকাশ পায় তাতে। নজর বর কদমের অর্থ নিজের কদমের প্রতি নজর রাখা অর্থাৎ পরবর্তী রূহানী মঞ্জিলের

উদ্দেশ্যে রূহানী পদচারণার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা, যাতে ক্রমাগত উন্নতি করবার উৎসাহ বেড়ে যেতে পারে। আর খেলাওয়াৎ দার আঞ্জুমান (জনতার মধ্যে নির্জনতা) উপরের মাকামে গেলে সালেকগণের স্বভাব হয়ে যায়।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি (রঃ) এরশাদ করেছেন '..... প্রারম্ভে জিকির করা ব্যতীত উপায় নেই। তোমার কর্তব্য এই যে, ছনুবার বৃক্ষের মতো আকৃতিধারী কলবের প্রতি লক্ষ্য করো, যেহেতু উহা সূক্ষ্ম জগতিস্থিত প্রকৃত কলবের আধার স্বরূপ। তারপর পবিত্র নাম 'আল্লাহ্' উক্ত কলবে পরিচালিত করতে থাক। ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো অঙ্গ আন্দোলিত করিও না। পূর্ণরূপে কলবের প্রতি মনোযোগী হইও। কলবের আকৃতির দিকে লক্ষ্য করিও না। কেনোনা কলবের প্রতি লক্ষ্য করা প্রয়োজন— কলবের আকৃতির প্রতি নয়। অতঃপর পবিত্র 'আল্লাহ্' শব্দকে প্রকারবিহীন ধারণা করিও, কোনো গুণ (সেফাত) তার সাথে মিশ্রিত করিও না। এরকম করলে আল্লাহ্পাকের জাতের উচ্চতা সেফাতের স্তরে নেমে আসবে। .....'

হজরত হাকিম আবদুল হাকিম র. প্রথমেই মুরিদগণকে এসমে জাতের (আল্লাহ্) জিকির কলবের প্রতি খেয়াল রেখে মনে মনে আবৃত্তি করতে বলতেন; যা ছিলো হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি (রঃ) এর উপরোক্ত নির্দেশের পূর্ণ অনুকূল।

হজরত মুরিদগণ সহ বৃত্তাকারে উপবেশন করে মোরাকাবা করতেন। বিভিন্ন স্থানের মুরিদগণকেও এ রকম নির্দেশ দিতেন। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি (রঃ) মোরাকাবা সম্পর্কে এ রকম নির্দেশই প্রদান করেছেন। যেমন তিনি বলেন, ... সকলেই একসঙ্গে হালকা বা বৃত্তকারে বসে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ফানি বা নিমজ্জিত হবেন। তবেই জমিয়ৎ বা আত্মিক প্রশান্তি লাভ হবে এবং উন্নতি হতে থাকেব।' .... (মকতুব নং ২৩৭, ১ম খণ্ড)।

হজরত প্রাথমিক স্তরের মুরিদগণকে এক বিশেষ সময় পর্যন্ত নফল নামাজ পড়তে নিষেধ করতেন। ফরজ সুষ্ঠুরূপে আদায় না হওয়া পর্যন্ত নফল আল্লাহ্পাকের দরবারে কবুল হয় না। কোনো ছাত্র আবশ্যিক বিষয়ে পাশ নম্বর না তুলতে পারলে ঐচ্ছিক বিষয়ে যতো বেশী ভালো ফল লাভ করুক না কেনো, পরীক্ষায় সে কখনো উত্তীর্ণ হতে পারে না। প্রাথমিক পর্যায়ে জিকিরই অধিক ফলপ্রদ। কারণ, গাফলত বা অমনোযোগিতা দূর করাই জিকিরের উদ্দেশ্য। জিকির যখন কলবে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন কলব সালিম (প্রশান্ত) অবস্থা ধারণ করে এবং তখনই নামাজ পড়বার সময় অন্তঃকরণে হুজুরী (একাগ্রচিত্ততা) আসে। কলবের হুজুরী ছাড়া নামাজ হয় না বলে হাদিস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। এই হুজুরী লাভ করলে বান্দাগণ আল্লাহ্পাকের হুকুম ফরজ নামাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হয়। এরূপ অবস্থা লাভের পরই হজরত নফল নামাজ পাঠের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতেন। এতেই বোঝয় যায়, মুরিদগণের কোন্ অবস্থায় কি করণীয়, তা সম্পর্কে তিনি ছিলেন

পূর্ণ সতর্ক। তাই সাধারণ সামঞ্জস্য থাকলেও বিভিন্ন মাকামের মুরিদগণকে তিনি বিভিন্ন রকমের আমলের নির্দেশ প্রদান করতেন।

হজরত মোজদ্দেদে আলফে সানি (রঃ) এর নির্দেশও এরকমই। তিনি এরশাদ করেন, 'প্রত্যেক মাকামের এলেম মারেফত পৃথক পৃথক। হালও তেমনি বিভিন্ন রকমের। হয়তো জিকির মোরাকাবা কোনো মাকামের উপযোগী। নামাজ পাঠ ও কোরআন শরীফ তেলাওয়াত অন্য কোনো মাকামের উপযোগী। জজবা কোনো মাকামের জন্য প্রয়োজন, আবার কোনো মাকামে সুলুক দরকার। আবার কোনো মাকামে দুইটিরই প্রয়োজন হয়। আবার কোনো মাকাম সুলক জজবা উভয় প্রকার বিষয়ের সহিতই সম্পর্কচ্যুত .....' (মকতুব নং ৩২, ১ম খণ্ড)।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি (রঃ) এরশাদ করেন, 'এ ফকিরের নিকট তরিকতে বেদাত (নতুনত্ব) সৃষ্টি শরীয়তে বেদাত সৃষ্টি অপেক্ষা কোনো ক্রমেই কম অপরাধ নয় .....।'

এই বাক্যের প্রতি পূর্ণ সতর্কতাবোধ ছিলো হজরত হাকিম আবদুল হাকিমের। বর্তমানে অনেকেই নকশ্‌বন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার নামে তরিকা বিরোধী কার্যে লিপ্ত। তাঁদের ইচ্ছাকৃত অথবা অজ্ঞতাবশতঃ কার্যকলাপের ফলে এই উচ্চ তরিকা তার বিকৃত রূপ পরিগ্রহ করেছে। যেমন— জিকরে জলি (সশব্দে জিকির) এই তরিকায় কঠোরভাবে নিষিদ্ধ থাকলেও এই তরিকার অনুসারী কেউ কেউ সশব্দে জিকিরে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। গান বাজনা গজল কাওয়ালী যা কিনা এই তরিকা বহির্ভূত কাজ তাও প্রচলন করেছেন এ তরিকারই কোনো কোনো মোবাল্লেগ। আবার এসমে জাত (আল্লাহ্) জিকিরের তালিম এর স্থলে কারো কারো দরবারে বিভিন্ন রকমের সেফাতি (গুণবাচক) জিকিরের প্রচলন করা হয়েছে।

মানুষের অন্তরের গায়রাল্লাহ্‌র আকর্ষণ দূর করতে গেলে সেখানে এক জাত পাকের মহব্বত প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। একারণেই এসমে জাতের জিকিরের ভিত্তিতে সালেকগণকে পথ চলতে শুরু করতে বলা হয়েছে এবং জিকির করা পর্যন্ত দায়িত্ব শেষ একথা মনে যাতে না আসে সে বিষয়েও সতর্ক করে দিয়েছেন হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি (রঃ। তিনি বলেছেন, 'আমাদের তরিকা আল্লাহ্‌পাকের কোনো নামের আমল করার তরিকা নয়। নামধারীর (আল্লাহ্) মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়াই আমাদের তরিকা।'

কেউ যদি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বা নাকেছ (অপূর্ণ) বা বেদাতী পীরের কাছে বায়াত গ্রহণ করে তরিকতের পথে উন্নতি করতে চায়, তবে তা কখনোই সম্ভব হবে না। সে বিষয়ে মোজাদ্দেদে আলফে সানি (রঃ) সাবধান করে দিয়েছেন এভাবে, 'শুধু তরিকা পৌঁছায় না, পৌঁছায় পীর।' অর্থাৎ ঐ ধরনের পীর তাঁর মুরিদগণকে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেন, যাঁরা তরিকার ইমামের পূর্ণ অনুসরণ

করে এ পথের পূর্ণ পরিচিতি সহ আল্লাহ্পাকের সামীপ্য অর্জন করেছেন। এ ধরনের পীরের সাহায্যেই কেবল শরীয়তের এক তৃতীয়াংশ— 'এখলাস' (নিয়তের বিশুদ্ধতা) হাসেল হতে পারে। এই এখলাসের সঙ্গে শরীয়তের অপর দুই অংশ এলেম ও আমল অর্জনকারীগণই শরীয়তের পূর্ণ পাবন্দ বলে অভিহিত হতে পারেন। শুধুমাত্র শরীয়তের বাহ্যিক আকৃতিই (জাহেরী শরীয়ত) যাদের বিচরণ ক্ষেত্র, সে ধরনের ব্যক্তিগণ ফেৎনা ছাড়া অন্য কিছুই করতে সক্ষম হবেন না। কোনো পূর্ণ বস্তু হতেই কেবল পূর্ণ ফায়দা পাওয়া সম্ভব। অপূর্ণ বস্তু হতে নয়। যে পুষ্প পূর্ণরূপে দল মেলেছে, পূর্ণ সৌরভ বিতরণ সে পুষ্পের পক্ষেই সম্ভব।

হজরত হাকিম আবদুল হাকিম র. তরিকার একনিষ্ঠ অনুসারী হিসাবে এই উচ্চ তরিকাকে বিকৃতির হাত থেকে মুক্ত রাখবার জন্য পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। আর এরকম সতর্কতা অবলম্বনের কারণেই এই তরিকার ফয়েজ বরকত পূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছিলো তাঁর শিক্ষায় দীক্ষায়, তাওয়াজ্জোহ্তে এবং আখলাকে।

হজরত হাকিম আবদুল হাকিম (রঃ) এর স্বভাব চরিত্র ছিলো হজরত রসূলেপাক (সঃ) এর প্রতিবিম্বত নমুনা। রসূলেপাক (সঃ) এর মতো তিনিও যখন কোনোদিকে বা কারো দিকে দৃষ্টিপাত করতেন, তখন সমস্ত শরীর সহকারেই সেদিকে তাকাতেন। শুধুমাত্র ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেন না। শামায়েলে তিরমিজি কেতাবের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত ৬নং হাদিসে রসূলেপাক (সঃ) এর এই স্বভাবের কথা বলা হয়েছে। '..... যখন (তিনি) কোনো দিকে বা কারো দিকে লক্ষ্য করতেন, তখন সমস্ত শরীর ফিরিয়ে লক্ষ্য করতেন।'

হজরত শরীয়তসম্মত কৌতুকপ্রদ গল্পও কখনো কখনো বলতেন। হজরত রসূলেপাক (সঃ) এর মধ্যেও এরূপ সূক্ষ্ম রসবোধ ছিল। শামায়েলে তিরমিজি কেতাবে এরকম কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়।

হজরত রসূলেপাক (সঃ) এর স্বভাবে যেমন কাউকে ধমকানো বা কটু কথা বলার অভ্যাস ছিলো না— তিনিও ছিলেন তদ্রূপ। বেশীর ভাগ সময়ই তিনি মিষ্ট কথায় মুরিদগণকে ভালো মন্দ বুঝিয়ে দিতেন। হঠাৎ কাউকে কড়া কিছু বলে ফেললে একটু পরেই তাঁর মুখমণ্ডল ছোট শিশুদের মতো হয়ে যেতো। মনে হতো অন্যায়কারী নয়, তিনি নিজে অন্যায় করে ফেলেছেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কাছে ডেকে তিনি এটা ওটা গল্প

বলতেন তখন। নিজের ছোট সন্তানদেরকে যেমন পিতা মাতা এটা ওটা দিয়ে ভোলায় তেমনি এট ওটা খাওয়াতেন, যাতে তার মনোকষ্ট দূর হয়ে যায়। হজরত কারো মনোক্ষুণ্ন মুখ এবং লজ্জা পাওয়া অবস্থা দেখা সহ্যই করতে পারতেন না।

অপরাধীদের জন্য তাঁর ছিলো গভীর মমত্ববোধ। তাঁদের জন্য তিনি দোয়া খায়ের করতেন বেশী বেশী করে। আশাধারী হয়ে থাকতেন। হয়তো কোনো এক সময়ে অন্তরের আবর্তনকারী আল্লাহ্তায়ালা তার অন্তরকে অপরাধ প্রবণতা থেকে মুক্ত করে দিবেন। নিজের দোয়ার প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে তিনি আল্লাহ্পাকের শোকর গোজারী করতেন। না হলেও নিরাশ হতেন না। আমৃত্যু এই নীতিতেই অটল ছিলেন তিনি। তাঁর স্নেহপরায়ণতা, দয়ার্দ্র-চিত্ততার প্রভাবে বহুলোক অসৎ কাজ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তাৎক্ষণিক দৃষ্টিতে কেউ কেউ তাঁকে পক্ষপাতকারী বলে মনে করতেন। কিন্তু তিনি তাতে ভ্রূক্ষেপ করতেন না। নিজের সন্তান সন্ততি হোক আর মুরিদান হোক সবারই প্রতি ছিলো তাঁর দয়া মেহেরবানির একইরকম বিরামহীন বর্ষণ। মানুষকে তিনি বাইরের দিক থেকে নয়, ভিতরের দিক থেকে এসলাহ (সংশোধন) করতে চাইতেন। সুতরাং মানুষের এসলাহের জন্য দীর্ঘদিন মৌনাবলম্বন বা ধৈর্যাবলম্বন করা ছাড়া তিনি অন্য কিছু ভাবতে পারতেন না। অন্তরের আবেগ মিশিয়ে কাউকে কাউকে কখনো কখনো বলতেন, 'খোকা আগুন নিয়ে খেলা করতে নেই।' কাউকে বলতেন, 'তোমরা অন্যায় করলে আমার বুকে কি রকম কষ্ট হয় জানো? ছুরি দিয়ে কলিজা ফেঁড়ে দিলে যে রকম কষ্ট হয়, সেরকম কষ্ট পাই আমি।' কখনো বলতেন, 'কেনো বোঝো না, আল্লাহ্পাক আমাকে তোমাদের জন্য রাখাল নিযুক্ত করেছেন।' কখনো কাউকে বলতেন, 'তোমরা তো আমার নিজের ছেলে মেয়েদের মতো, বরং তার চেয়ে বেশী। কারণ, তোমরা আল্লাহ্র রসূলের পথে রয়েছো।' কখনো বলতেন, 'আমার দশ ছেলের মধ্যে যদি একজন খারাপ হয়, তবে তাকে তো আমি ফেলে দিতে পারি না।' মুরিদগণের অর্থ সম্পদ শোষণকারী পীরগণের প্রসঙ্গে তিনি বলতেন, 'যারা আমার নিকট বায়াত হয়, তারা তো আমারই পরিবারভুক্ত। নিজের পরিবারের লোকজনকে কি কেউ মেরে ধরে খায়।'

হজরত মুরিদগণের দৃষ্টিতে এরকম ছিলেন যে, প্রত্যেকেই মনে করতেন, হজরত বুঝি 'আমাকেই সবচেয়ে বেশী ভালোবাসেন।' এরকম স্বভাব সত্যিই দুর্লভ। এ যে অবিকল আখলাকে রসূল (সঃ)।

শামায়েলে তিরমিজি কিতাবে উল্লিখিত হাদিসে হজরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কওমের নিম্নতম মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হওয়ার উদ্দেশ্যে বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে ব্যবহার ও কথা বলতেন। রসূলেপাক (সঃ) আমার প্রতিও বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করতেন এবং বিশেষ অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করতেন তাতে আমার মনে হতো যে, রসূলেপাক (সঃ) এর দৃষ্টিতে আমিই গোত্রের

শ্রেষ্ঠ লোক। একদিন আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লহ! আমি উত্তম না আবুবকর উত্তম? তিনি ফরমালেন, 'আবুবকর।' পুনরায় আমি বললাম, আমি উত্তম না ওমর উত্তম।' তিনি এরশাদ করলেন, 'ওমর।' আমি পুনঃ প্রশ্ন করলাম 'হে রাসূলাল্লহ্! আমি ভালো না ওসমান ভালো? তিনি জবাব দিলেন, 'ওসমান।' আমি যখন সরাসরি রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর নিকট প্রশ্ন করলাম, তিনি সত্য জবাব দিলেন। তখন আমি ভাবলাম এরকম বেমানান প্রশ্ন আমার না করাই উচিত ছিলো।'

এই হাদিসের টিকায় বলা হয়েছে 'যতো বড় উদার লোকই হোক না কেনো দুনিয়াতে কেউ নিজের সমস্ত লোককে সমানভাবে সন্তুষ্ট রাখতে পারেননি। হজরত রসূল (সঃ) এর উদার চরিত্রের বিশেষ অতুলনীয় গুণ এই ছিলো যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই মনে করতেন, 'আমি রসূল স. এর সর্বাধিক প্রিয়পাত্র।'

এই দুর্লভ আখলাকে রসূলের (সঃ) পূর্ণ প্রতিবিম্ব হজরত হাকিম আবদুল হাকিম (রঃ) এর স্বভাবে বিরাজমান ছিলো। তিনি নসিহত করতেন তাঁর সহজ সরল ভাষায়, 'শুধু টুপি দাড়ি রাখলেই সুন্নত হয় না। আখলাকে রসূল (সঃ) ধরার চেষ্টা করেন।'

আউলিয়াগণের কারামত সত্য। প্রত্যেক অলির মাধ্যমেই অল্প বিস্তর কারামত প্রকাশিত হয়ে থাকে। তবে কোনো অলিআল্লাহ্ই ইচ্ছাকৃতভাবে অলৌকিক কার্যাবলী প্রকাশের আকাঙ্খা করেন না। নবী (আঃ)গণের জন্য অলৌকিক কার্যাবলী (মোজেজা) প্রকাশ করা জরুরী। কিন্তু অলিগণের কারামত গোপন রাখা জরুরী। আল্লাহ্পাকই তাঁর প্রিয় বান্দাগণের দ্বারা নানা রকম বিচিত্র ঘটনাবলী প্রকাশ করে থাকেন যাতে অলি আল্লাহ্গণের নিজেদের কোনো এখতিয়ার থাকে না।

কারামত হজরতের জীবনেও অনেক সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু সে সমস্ত বেশীর ভাগই, লোকে যেরূপ কারামত দর্শনের অভিলাষী, সে রকম নয়। আসলে কারামত সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষেরই দৃষ্টিভঙ্গি বিকৃত।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সান (রঃ) এরশাদ করেছেন, 'হে ভ্রাতঃ মনোযোগের সঙ্গে শুনুন যে, অলৌকিক বা স্বভাবের বিপরীত কার্যকলাপ দুই ধরনের। প্রথম প্রকার ঐ এলমে মারেফতসমূহ যা আল্লাহ্পাকের পবিত্র জাত, সেফাত (গুণাবলী) বা আফআলের (কার্যাবলীর) সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। ইহা চিন্তা ও জ্ঞানের ঊর্ধ্বে এবং প্রচলিত নিয়ম কানুনের বিপরীত। আল্লাহ্তায়ালার বিশিষ্ট

বান্দাগণই ইহা পেয়ে থাকেন। দ্বিতীয় প্রকার, সৃষ্ট বস্তুসমূহের কাশফ (বিকাশ) ও অদৃশ্য বস্তুর সংবাদ প্রাপ্তি (এলহাম) যা এই দৈহিক জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রথম প্রকারটি হকপন্থী দল আল্লাহ্পাকের মারেফত প্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য। দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে সত্য মিথ্যা ও ভালোমন্দ সকলেই সমান অংশীদার। প্রথম ধরন আল্লাহ্পাকের নিকট সম্মানজনক ও মূল্যবান। সেই কারণে নিজের অলিগণকেই তিনি তা দিয়ে থাকেন। শত্রুদেরকে তিনি এসবের অংশ প্রদান করেন না। দ্বিতীয় প্রকার লোকসমাজে অতি মূল্যবান। এমন মূল্যবান যে, কোনো ফাসেক ফাজেরের দ্বারাও যদি উক্তরূপ কাজ সংঘটিত হয়, তবে সে ভালো মন্দ যাই বলুক তা আনুগত্যের সঙ্গে লোকেরা পালন করার চেষ্ট করে। বরং সাধারণ লোকেরা প্রথম প্রকারটিকে যেনো কারামতই মনে করে না। দ্বিতীয় প্রকারটিই তাদের নিকট আসল কারামত। সৃষ্ট পদার্থের কাশফ্ ও এলহামকেই এই সমস্ত বঞ্চিত ব্যক্তিগণ একমাত্র কাশফ্ ও কারামত বলে ধারণা করে। এরা আশ্চর্য রকমের আহম্মক। মূল্যহীন দৃশ্য অদৃশ্য সৃষ্ট পদার্থের অবস্থার কিইবা মূল্য আছে? এতে কিইবা কারামত হাসেল হয়? মূল্যহীন এ সমস্ত বিষয় ভুল মনে করাই উচিত যেনো সৃষ্ট বস্তু এবং সৃষ্ট বস্তুর অবস্থার চিন্তা অন্তর থেকে অপসৃত হয়। অবশ্যম্ভাবী জাত, আল্লাহ্তায়ালার মারেফতই মূল্যবান, সম্মানজনক এবং গৌরবের।' (মকতুব নং ২৯৩, ১ম খণ্ড)।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি (রঃ) এর উপরোক্ত বর্ণনাতে প্রকৃত কারামতের পরিচয় বিধৃত হয়েছে। সুতরাং সাধারণ লোকের নিকট মকবুল না হলেও এই সিলসিলার অন্যান্য বুজুর্গগণের মতো হজরত হাকিম আবদুল হাকিম (রঃ)ও মারেফত সম্বন্ধীয় মূল কারামতের অভিলাষী ছিলেন।

মৃতকে জিন্দা করা সাধারণ মানুষের নিকট শ্রেষ্ঠ কারামত। কিন্তু এই সিলসিলার বুজুর্গগণের নিকট এই কারামত মূল্যহীন। বরং আরশের সঙ্গে তুলনীয় মানুষের কলবে জীবনের স্পন্দন প্রদানই তাঁদের কাছে মূল্যবান। শুধু তাই নয়। কলবে জীবনের স্পন্দন প্রদানের পরে স্থায়ীভাবে শরহে সদরের ফয়েজ জারী রাখাও এই সিলসিলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। হজরত সারা জীবন এই কারামতের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন। তাঁর আঙুলের স্পর্শে হাজার হাজার কলুষিত মৃত দিল পেয়েছে অনন্তজীবনের আস্বাদ। পেয়েছে আল্লাহ্ প্রেম— মকছুদ মঞ্জিলের প্রকৃত নিশানা। হজরতের নিকট বায়াত হবার পরক্ষণেই মুরিদগণের কলব জিন্দা হয়ে উঠতো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে। না হলেও তিনি বলতেন, এই তরিকায় ঊর্ধ্ব সময় চল্লিশ দিনের মধ্যে কলব জিন্দা হয়। তাঁর আরও বিশেষ কারামত এই যে, তিনি তাঁর প্রতিনিধিদেরকেও মৃত কলবে অতিদ্রুত জীবন প্রদান করবার যোগ্যতাধারী করে গড়ে তুলেছেন।

এই মূল কারামতের প্রতি হজরতের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকলেও তাঁর দ্বারা বাহ্যিকভাবেও কিছু কিছু কারামত আল্লাহ্পাকের ইচ্ছায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সে সমস্ত উল্লেখ করার তেমন প্রয়োজন কী।

কামালত শব্দের অর্থ পূর্ণতা। কামালতের বিভিন্ন স্তর আছে। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে। কামেল ব্যক্তিগণ আল্লাহ্পাকের দরবারে এক এক জন এক এক রকম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

মানুষের মধ্যে যাঁরা সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ তাঁদেরকে নবী, রসূল বলা হয়। তাঁরা আল্লাহ্পাক কর্তৃক নির্বাচিত বান্দা। তাঁদের সকলকেই নবী হিসাবে মানতে হবে। নবুয়তের মর্যাদার ব্যাপারে তাঁদের একজনকে আর একজনের সঙ্গে পার্থক্য করা যায় না। যেমন আল্লাহ্পাক শিখিয়ে দিয়েছেন 'লা নুফাররিকু বায়না আহাদিম মির রসূলি' (আমরা রসূলদের মধ্যে পার্থক্য করি না)। পুষ্পের কাননে বহু পুষ্প ফোটে। প্রত্যেক ধরনের পুষ্পই পুষ্প। যেমন কবি বলেন, 'হর গুলেরা রঙ্গে বু দিগারাস্ত' প্রত্যেক ফুলই ফুল। এক এক ফুল এক এক বর্ণের। প্রত্যেক ফুলের সুবাস ভিন্ন ভিন্ন।

এ কারণেই দেখা যায়, মুসা (আঃ) কলিমুল্লাহ্ (আল্লাহ্র কালাম), ইসা (আঃ) রুহুল্লাহ্ (আল্লাহ্পাকের রূহ), ইব্রাহিম (আঃ) খলিলুল্লাহ্ (আল্লাহর বন্ধু) ইত্যাদি। কিন্তু এরকম হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে সামগ্রিকভাবে একজনের উপরে অপরজনের শ্রেষ্ঠত্বের অবকাশ আছে। যেমন, সমস্ত নবী রসূলগণের উপরে জনাবে মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) শ্রেষ্ঠ। আবার উলুল আজম পয়গম্বর (আঃ)গণ রসূলগণের উপরে আবার রসূলগণ নবী (আঃ) গণের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন।

আল্লাহ্পাকের অলিগণের ক্ষেত্রেও এইরূপ ধারণা রাখতে হবে। তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন জন বিভিন্ন প্রকার কামালতের অধিকারী। তাঁরা সকলেই আল্লাহ্পাকের অলি। নবীগণের মতো অলিগণের ক্ষেত্রেও পার্থক্য করা যায় না। তাঁরাও একই বাগানের বিভিন্ন ফুলের মতো। এক এক ফুলের এক এক রকমের সুরভি, এক এক রকমের রং। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে তাঁরাও একজন আর একজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন। মোজাদ্দেদ, ইমাম, কুতুবে এরশাদ, কুতুবে আবদাল, নুজাবা, নুকাবা, গাউস ইত্যাদি অলিগণের বিভিন্ন প্রকার পদমর্যাদা। মোজদ্দেদগণের মধ্যে যিনি শতাব্দীর মোজাদ্দেদ তাঁর উপরে সহস্রাব্দের মোজাদ্দেদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত। এরকম অন্যান্য পদের ক্ষেত্রেও ধারণা করা যায়।

হজরত হকিম আবদুল হাকিম ছিলেন এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অনন্যসাধারণ বুজুর্গ। নিজের কামালত সম্পর্কে তিনি এরূপ সতর্কভাবে গোপনীয়তা বজায় রাখতেন যে, তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ মুরিদগণও তাঁর কামালতের সঠিক পরিমাপ বুঝবার ক্ষমতা রাখতেন না। কিভাবেই বা পরিমাপ করা সম্ভব? তার কামালত তো ছিলো জাতি কামালত। এক জাতের প্রেমে তিনি এতই বিভোর থাকতেন যে, সেফাতের (গুণাবলীর) প্রতি তাঁর লক্ষ্য ছিলো না মোটেও। যাঁরা সেফাতি কামালাতসম্পন্ন বুজুর্গ তাঁরা আল্লাহ্পাকের যে কোনো সেফাতের নূরে রঞ্জিত হন। কিন্তু যাঁরা সেফাতের বৃত্ত অতিক্রম করে সমস্ত কিছুর মূল একমাত্র প্রকারবিহীন জাতের মহব্বতে বিলীন হয়েছেন তাঁদের কামালাত আল্লাহ্পাকের জাতের মতোই রহস্যময় হয়। আল্লাহ্পাকের জাত যেমন ধারণা, কল্পনার ঊর্ধ্বে, যার কোনো মেসাল (উদাহরণ) নেই; যিনি যাবতীয় আনুরূপ্য থেকে পবিত্র, সেই জাতের মহব্বতে বিলীন ব্যক্তির কামালাতও তেমনি আনুরূপ্যবিহীন। জ্ঞান ও ধারণার মধ্যে তার স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্পাক নিত্য নতুন অবস্থাধারী 'কুল্লা ইয়াওমিন হুয়া ফি শা'ন।'

তাই তাঁর জাতি প্রেমিকগণও লাভ করেন এমন কামালাত যা নিত্য নতুন শানে রঞ্জিত।

হজরত ছিলেন রহস্যময় বুজুর্গ। তাঁর নূরে নূরময় স্বচ্ছ কাঁচের মতো অবয়বে সিলসিলার পূর্ববর্তী বুজুর্গগণের স্বভাব আখলাক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে প্রতিফলিত হতো। মকতুবাত শরীফ পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, এরকম ধরনের বুজুর্গ অত্যন্ত বিরল। বহু বছর পর দুনিয়ার জমিনে এরকম অবাক প্রেমময় পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়।

তিনি নিজের কামালাতের গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে ছিলেন হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ (রঃ) এর মতো। প্রেমের আবেগের ব্যাপারে ছিলেন হজরত খাজা বায়জিদ বোস্তামির (রঃ) মতো মত্ততাময়। দ্বীনের সংস্কার চিন্তায় ছিলেন হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি (রঃ) এর মতো। ফয়েজের তেজস্বিতা ও শক্তিময়তার ক্ষেত্রে খাজা মোহাম্মদ মাসুম (রঃ) এর মতো। সম্পূর্ণ দুনিয়াদার মানুষের মতো জীবন যাপন করা সত্ত্বেও কামালতের উচ্চ শিখরে সার্বক্ষণিক অবস্থানের ব্যাপারে ছিলেন খাজা ওবায়দুল্লাহ্ আহরার (রঃ) এর মতো। ফয়েজ বিতরণের যোগ্যতার দিক থেকে হজরত খাজা নকশবন্দ (রঃ) এর মতো। আর নিজ মুরিদগণের প্রতি মহব্বত পোষণের ব্যাপারে ছিলেন রসূলেপাক (সঃ) এর মতো। সিলসিলার ঊর্ধ্বতন পীরগণের মধ্যে হজরত খাজেগী আমকাঙ্গী (রঃ) এর মতো তিনি জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তরিকা প্রচারের কাজ শুরু করেছিলেন।

হজরত ছিলেন এক রহস্যময়, প্রেমময়, অনন্যসাধারণ অলি। তিনি ছিলেন বেলায়েতের বাগানের এক বিরল কুসুম। তাঁর কামালাতের পরিচয় সাধারণ ভাষায় দেওয়া অসম্ভব। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি (রঃ) এর যে বর্ণনা তাঁর কামালাতের বর্ণনার অনুকূল, আবেগ বিবর্জিত নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাই তাঁর কামালাতের সঠিক বর্ণনা বলে সমীচীন মনে হয়। প্রকৃত তত্ত্ব আল্লাহ্পাকই অধিক জ্ঞাত।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি (রঃ) বলেন, 'কুতুবে এরশাদ' যিনি ফরদিয়াত বা অসাধারণত্বের সকল প্রকার গুণ সম্পন্ন, এরূপ ব্যক্তি অত্যন্ত অপ্রতুল। দীর্ঘদিন পর পর এরূপ রত্নতুল্য ব্যক্তি আবির্ভূত হন এবং তাঁর আবির্ভাবের ফলে তমসাচ্ছন্ন দুনিয়া আলোকিত হয়। তাঁর হেদায়েতের নূরে আরশ থেকে ফরশ পর্যন্ত সকলেই শামিল থাকে। যে কেউ হেদায়েত ও ইমান লাভ করুক না কেনো, তাহা তাঁর নিকট থেকেই লাভ করে, তাঁর মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে কেউই উক্ত দৌলত অর্জন করতে সক্ষম হয় না। তাঁর নূরের দৃষ্টান্ত, যেমন, প্রশান্ত মহাসাগর যা সমস্ত পৃথিবী বেষ্টন করে আছে। কিন্তু তা স্থির— কিছুমাত্র স্পন্দন যেনো তাতে নেই। যে কোনো ব্যক্তি যদি উক্ত বুজর্গের প্রতি মনোযোগী হয় এবং তাঁর সঙ্গে বিশেষ মহব্বতের বন্ধন স্থাপন করে অথবা উক্ত বুজুর্গ যদি কোনো তালেবের প্রতি মনোযোগ প্রদান করেন, তখন তাঁর তাওয়াজ্জোহের ফলে সংশ্লিষ্ট তালেবের হৃদয়ের বাতায়ন উন্মুক্ত হয় এবং আকৃষ্টতা এবং বিশুদ্ধতা অনুযায়ী সে উক্ত মহাসাগর থেকে পরিতৃপ্তি লাভ করতে থাকে। তদ্রূপ যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ্পাকের জিকিরে বিভোর থাকে, কিন্তু উক্ত বুজর্গের প্রতি মোটেও লক্ষ্য না করে, অবশ্যই তা অস্বীকৃতি বশতঃ নয় বরং সেই বুজুর্গ ব্যক্তির পরিচয়ই সে জানেনা— এরকম অবস্থাতেও সে একইরূপ ফায়দা লাভ করতে পারবে। আবার যে ব্যক্তি তাঁকে অস্বীকার করবে অথবা তিনি যাঁর প্রতি মনোকষ্ট রাখবেন, সে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যতোই আল্লাহ্পাকের জিকিরে মশগুল থাকুন না কেনো, প্রকৃত হেদায়েত ও সরল পথের সন্ধান তাঁর নসিব হবে না। তাদের অস্বীকৃতি এবং মনোকষ্ট প্রদানের জন্যই এরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। এরকম নয় যে, এইরূপ বুজুর্গ ব্যক্তি কারো অনিষ্টের চিন্তা করেন বা কারো ফায়দা অর্জনে বাধা সৃষ্টি করেন। এরূপ বদনসিব ব্যক্তিগণ প্রকৃত হেদায়েত থেকে বঞ্চিত। তাঁদের হেদায়েত বাহ্যিক হেদায়েত মাত্র। আভ্যন্তরীণ হেদায়েত ব্যতিরেকে বাহ্যিক হেদায়েতের বিশেষ কোনো মূল্য নেই। কিন্তু যে দল উক্ত বুজর্গের সঙ্গে খালেস মহব্বত রাখেন, তাঁরা আল্লাহ্পাকের জিকির থেকে গাফেল থাকলেও কেবল মহব্বতের বন্ধনের মাধ্যমে তাঁরা হেদায়েতের নূর প্রাপ্ত হন।' ..... (মকতুব নং ২৬০, ১ম খণ্ড)।

শেষ পর্যন্ত তাই হলো।

অতিরিক্ত সফর আর সাংসারিক খাটুনির ধকল শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে পারলেন না তিনি। বয়স ষাট পেরিয়েছে। এই বৃদ্ধ বয়সে কদিন পর পরই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সফরে বেরিয়ে পড়তে হয়। কতো জায়গায় যেতে হয়। কতো

লোকালয়ে যেয়ে আশেকগণের হৃদয়-দুয়ারে করাঘাত করে তাদেরকে জাগিয়ে দিতে হয়। বিস্মৃত মানুষ, জাগো, ওঠো। কলবের বিরান কাননে আবার বপন করো আল্লাহ্ প্রেমের সতেজ চারা। আবার তাতে কিশলয় উঁকি দিবে। সবুজ পাতায় ছেয়ে যাবে চারিধার। ফুল ফুটবে। সুবাস ছড়িয়ে পড়বে দিকে দিকে। আল্লাহ্ প্রেমের বেহেশতি সুবাস।

শেষ পর্যন্ত বার্ধক্য আক্রান্ত শরীর এতো কষ্ট সহ্য করতে পারলো না। অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। বাধ্য হয়ে সফর কমাতে হলো। মাঝে মাঝে শ্বাসকষ্ট হতে শুরু করলো তাঁর।

একবার তিনি ঢাকায় এসে বললেন, 'হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি (রঃ) এর হাঁফ দেখা দিয়েছিলো শেষ বয়সে জানো? মুরিদগণ বললেন, হ্যাঁ তাই।'

তিনি একজনকে বললেন, 'ভালোভাবে কাজ করলে না। তোমাকে খেলাফত দিয়ে যেতুম।'

সম্বোধিত ব্যক্তি এতে বিচলিত হয় না কিছুতেই। ভাবে, আহা এই পীর। এই বৃদ্ধ বুজুর্গ। সারা অবয়ব তাঁর আল্লাহ্ প্রেমের নূরে জ্বল জ্বল করে সারাক্ষণ। মানুষকে এতো ভালোবাসেন তিনি। ঐরকম উদার অন্তর আর কার আছে? ঐরূপ প্রশস্ত প্রেমময় বুক যার নেই তার খেলাফতনামা নিয়ে কি হবে। এ পথের যাঁরা পীর হবেন, যাঁরা খলিফা হবেন, তাঁদেরকে তো ঐরকমই হওয়া উচিত হজরত যেমন ছিলেন। এ জামানায় কে আছে অমন মহান?

হজরত একবার বার্ষিক মহফিলে বললেন, 'আমার জন্য আপনারা সবাই দোয়া করবেন। আল্লাহ্পাক আর কতোদিন হায়াতে রাখেন জানিনে।'

নানা রোগের উপসর্গ দেখা দিলো ক্রমে ক্রমে। নাক দিয়ে রক্ত পড়া রোগটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো অনেক দিন পর। তিরিশ বছর আগে যেমন ছিলো। একেক বার এরকম হয়— আধাসের খানেক লাল টকটকে তাজা রক্ত নাক দিয়ে ঝরে যায় টপ্ টপ্ করে। রক্ত মুছবার জন্য ব্যবহৃত বস্ত্রখণ্ড লালে লাল হয়ে যায়।

হজরত বলেন, 'প্রায় তিরিশ বছর এ রোগটা ছিলো না। তার আগে মাঝে মাঝেই আমার নাক দিয়ে এরকম রক্ত ঝরতো। একবার এক মজজুব দরবেশ এলেন। তাঁকে খুব যত্ন করে খাওয়ালেন আব্বা। তারপর বললেন, খোকার জন্য দোয়া করুন। সেই মজজুব আমার মাথায় দিল এক ফুঁ। ব্যাস। তারপর থেকেই নাক দিয়ে রক্ত পড়া রোগ বন্ধ হয়ে গেলো আমার।'

তিরিশ বছর ধরে রোগটা ছিলো না। আবার এতোদিন পরে পুরানো রোগ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। একেক বার রক্ত ঝরে যায় অনেক। একেবারে তাজা লাল টক্‌টকে রক্ত।

চিকিৎসা চললো। ঢাকায় এসে বড় ডাক্তার দেখালেন তিনি। এ্যালোপ্যাথ চিকিৎসার উপরেই তাঁর বিশ্বাস বেশী। বেশ কিছুদিন চিকিৎসার পর আল্লাহ্পাক রহম করলেন। রোগটা অনেক উপশম হলো। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো অনেক রোগ দেখা দিতে শুরু করলো।

শ্বাসকষ্টের সাথে ডাইবেটিকসও দেখা দিলো এবার। মিষ্টি, মিষ্টান্ন ছিলো হজরতের অত্যন্ত প্রিয়। রোগের কারণে মিষ্টি জাতীয় খাবারও বাদ দিতে হলো।

সফর আগের মতো করতে পারেন না বটে। কিন্তু রোগের প্রকোপ কম থাকলে ঘরেও বসে থাকতে পারেন না চুপচাপ। দায়িত্ববোধ প্রবল হয়। মনে হয়, আল্লাহ্পাকের বান্দাগণের খেদমতে ত্রুটি হলে আল্লাহ্পাকের নিকট জবাবদিহি করবেন কিভাবে?

হজরত কোনো স্থানে গেলে সে স্থানের মুরিদগণ যেনো হাতে চাঁদ পেতেন। খুশীর অন্ত থাকতো না তাঁদের। তাঁর আপ্যায়নের জন্য, আহারের জন্য তাঁরা করতেন বিরাট আয়োজন। হজরত এরকম আড়ম্বর পছন্দ করতেন না মোটেও। এতো খরচ খরচা করতে বারণ করতেন। কিন্তু মুরিদগণের মহব্বতের আতিশয্যের সামনে কোনো কথা কুলোত না। হজরত ভাবতেন, আহা এদেশের মানুষ বেশীর ভাগই তো আর্থিক অসচ্ছলতার শিকার। মহব্বতের উন্মাদনায় স্বাভাবিক জ্ঞান থাকে না তাদের। তারা বোঝে না, এসব মহব্বতের নিদর্শন বটে। কিন্তু কি প্রয়োজন এই আড়ম্বরের। এ সব তো মূল মকছুদ নয়। খাঁটি আল্লাহ্ প্রেমিকগণ তো আড়ম্বরমুক্ত পরিবেশেই স্বস্তি পান বেশী।

হজরত তাই একবার ঠিক করলেন, যেখানেই সফরে যাবেন, এক তরকারী ছাড়া দুই তরকারী তিনি খাবেন না। একথা সবাইকে জানিয়েও দিলেন তিনি।

তারপর থেকে সফরের সময় একাধিক ব্যঞ্জন তাঁর দস্তর খানায় হাজির করা হলে তিনি বলতেন, 'যে কোনো একটা তরকারী দিন আমাকে, যেটা আপনার পছন্দ।' কেউ সবগুলো গ্রহণ করার আবদার জানালে তিনি বলতেন 'কথা উল্টানো কি ঠিক।'

এভাবে হজরত সফরের সময় এক ব্যঞ্জনে আহার সমাপ্ত করবার নিয়ম নিজে নিজে স্থির করলেন। কখনো শুধু বেগুন ভাজী, কখনো কোনো শাক সবজী, কখনো সামান্য আমিষ, আবার কখনো শুধু ডাল দিয়ে ভাত খেতেন তিনি সফরের সময়।

একেতো হজরতের আহারের পরিমাণ ছিলো অত্যন্ত কম। তার উপর সফর অবস্থায় দারুণ পরিশ্রমের পর প্রয়োজনীয় পুষ্টি জাত খাদ্য গ্রহণ না করায় তাঁর শরীর দুর্বল হতে লাগলো দিন দিন। ছোট শিশুদের মতো কিছুক্ষণ পর পরই সামান্য পরিমাণ কিছু খেতে পছন্দ করতেন তিনি। কিন্তু স্বল্প পরিচিত কোনো স্থানে গেলে লজ্জায় কারো কাছে চাইতেন না কিছু। আবার অতি ঘনিষ্ট কোনো মুরিদান, যাঁরা ছিলেন তাঁর সঙ্গে একেবারেই ওৎপ্রোতভাবে জড়িত তাঁদের বাড়ীতে

গেলে আর জড়তা থাকতো না হজরতের। হয়তো রাত দুটো তিনটের সময়ই বলে ফেলতেন, 'আমার খিদে পেয়েছে যে।'

কিছু বিস্কুট বা এ ধরনের সামান্য কিছু সামনে হাজির করা হলে তিনি তখন খুশী হতেন খুব। সামান্য কিছু মুখে দিতেন। স্বস্তি বোধ করতেন। তারপর হয়তো সেই গভীর রাতেই অন্তরের সমস্ত আবেগটুকু মিশিয়ে দোয়ায়ে হেজবুল বাহার পড়তেন। কখনো পড়তেন দরূদ শরীফ। দীর্ঘক্ষণ ধরে আল্লাহ্পাকের দরবারে দোয়া করতেন, 'ইয়া আল্লাহ্ আমাদেরকে গাফেল রেখো না তোমার বন্দেগী হতে, গাফেল রেখো না গাফেল রেখো না গাফেল রেখো না। ইয়া আল্লাহ্ দেশবাসীকে হেদায়েত করো মাবুদ প্রতিবেশীকে হেদায়েত করো। হক প্রতিষ্ঠিত করো বাতিল ধ্বংস করে দাও ইয়া আল্লাহ। বাতিল ধ্বংস করে দাও, ধ্বংস করে দাও।'

তারপর হয়তো বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়তেন। একটু পরেই উঠে বসতেন হয়তোবা। বাইরে বারান্দায় এসে বসতেন। উদাস নয়নে তাকিয়ে থাকতেন কোনোদিকে কে জানে? পাশে কেউ থাকলে তার সামনে কথা বলতেন এক এক সময় এক একটা। বেশীর ভাগই বিভিন্ন স্থানের মুরিদগণের কথা। সবারই সাংসারিক অবস্থা আয়-ব্যয়, রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্টের খবরাখবর রাখতেন তিনি। তাঁদেরই কথা বলতেন একে একে। কারো সম্পর্কে বলতেন, 'আহা তার কি কষ্ট যাচ্ছে। ছেলেপুলে নিয়ে মাঝে মাঝে উপোস করে কাটাতে হয়।' কখনো বলতেন, আর একজনের সম্পর্কে। 'আহা কি কষ্টটা গেলো তার।' এরকম এক এক করে বলেই যেতেন বিভিন্ন মুরিদগণের কথা। কখনো মনে হতো নিজের সঙ্গেই নিজে নিজে আলাপ করেছেন তিনি। ঐ সময় কেউ পাশে বসে ঘুমে ঢুলু ঢুলু করলে তিনি বলতেন, 'তুমি শুয়ে পড়ো। ঘুমোও গে। আমার ঘুম আসবে না। তুমি তো একা ছেলে না। কতোজন কতো অসুবিধায় দিন কাটাচ্ছে। আমার ঘুম আসবে না।'

হজরতের শরীর ঘন ঘন খারাপ হতে শুরু করলো। পারিবারিক পরিবেশ অনুকূল ছিলো না। পরিবারের প্রায় সবাই কিছুটা জাঁক জমকময় জীবন যাপনের আকাঙ্খী ছিলেন। উৎসাহী মুরিদও জুটলেন কিছু। অর্থশালী কিছু মুরিদ শামিল ছিলেন জামাতে।

পুরানো কুটিরটা নড়বড়ে হয়ে গেছে। বয়সতো হয়েছে অনেক। সেই কবে ঘরের চাল ছাওয়া হয়েছিলো। দেয়ালের বেড়াগুলো কেমন দুর্বল হয়ে গিয়েছে। জীর্ণ শীর্ণ প্রায়। বাড়ীটা মেরামত করা প্রয়োজন। কিন্তু পারিবারিক চাপ, উৎসাহী সম্পদশালী মুরিদগণের ইচ্ছা ইত্যাদি সব কারণে হজরত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইটের তৈরী নতুন বাড়ী করার মনস্থ করলেন।

তাই হলো। গোলপাতার কুটির ভাঙা হলো। তৈরী হলো পাকা বাড়ী। মাটির খানকাও ভাঙা হলো, প্রস্তুত করা হলো বিরাট আকৃতির পাকা খানকা। মোজাইক করা মেঝে।

খুশী হলেন অনেকে। আগে কেউ কেউ সখ করে বলতেন, 'আমাদের মার্বেল পাথরের তৈরী খানকা দরকার।' শেষ পর্যন্ত তাই হলো। হজরতের নিজ হাতে লাগানো গাছ গাছালী কাটতে হলো। বনানী কমলো। জায়গাটা হলো কেমন ফাঁকা ফাঁকা।

আগের সেই ছায়া ঢাকা ভাবটা আর নেই। সেই কালুতলা গ্রামের স্মৃতি যেনো মুছে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। খানকার পশ্চিম পাশ জুড়ে বিস্তৃত সেই মানি প্ল্যান্ট গাছটা— মাটির খানকার বুকে যে সারাক্ষণ বুক মিলিয়ে থাকতো, তার আর চিহ্ন নেই এখন। সেই সফেদা গাছটাও কেটে ফেলতে হয়েছে। ওষুধ তৈরীর ঘরটা ভেঙে সামনের দিকে জায়গা বাড়াতে হয়েছে— না হলে এখন আর বার্ষিক মহফিলের সময় মানুষের জায়গা হয় না। লোকজনতো বেড়েই যাচ্ছে দিন দিন। আশে পাশে কতো ওষুধের গাছ ছিলো। সব তুলে ফেলতে হয়েছে।

পাকা খানকা করতে গিয়ে কাটতে হয়েছে অনেকগুলো তেজপাতা গাছ। সেই প্রেমময় কুটির, সেই মাটির খানকা কোথায় হারিয়ে গেলো?

সব হলো। কিন্তু হজরতের শরীর ভেঙে পড়তে লাগলো দ্রুত। নীরব হয়ে যান তিনি ক্রমে ক্রমে। আগের মতো আর কথা বার্তায় উচ্ছলতা উদ্দামতা নেই। শরীরের তেজিভাব কমে গেছে। ঘরের বাইরে খুব কমই যেতে পারেন। ঘর আর বারন্দাতেই বেশীর ভাগ সময় কাটাতে হয়। সব সময় কিসের এক অস্বস্তি বোধ, কিসের এক যন্ত্রণা তাঁকে অস্থির করে রাখতে চায়। সে যন্ত্রণা শারীরিক, মানসিক দুইই। মনে হয় উন্মুক্ত আকাশের কোনো উড়ন্ত পাখিকে পিঞ্জরাবদ্ধ করা হয়েছে। অগাধ সলিলে মনের সুখে সন্তরণরত কোনো মাছকে ডাঙায় উঠিয়ে আনা হয়েছে। হয়তো সেই মাটির উঁচু ভিতের ওপরে তৈরী গোল পাতার কুটির আবার তিনি ফিরে পেতে চান। যে কুটিরের সাথে গলায় গলায় জড়িয়ে ছিলো কালুতলার স্মৃতি। প্রিয় মোর্শেদের স্মৃতি। মনে হয় সেই খানকা আবার ফিতে পেতে চান তিনি। সেই মাটির মমতা জড়ানো কুঞ্জবনের মাঝে প্রস্ফুটিত বেহেশতী কুসুম। কতো অলি আল্লাহ্‌র রূহানী আনাগোনায় মুখর ছিলো ঐ মাটির মহফিল।

জীবন চলেছে জীবনের গতিপথে
জীবন চলেছে জীবনের জজবায়;
পথে যেতে যেতে ফিরে চাই পিছ-পথে
কতো স্মৃতি জ্বলে মাটির ঐ খানকায়।

নতুন আর এক রোগ দেখা দিলো। সমস্ত শরীরে রস। দাওয়াখানায় যাওয়া বাধ্য হয়েই বাদ দিতে হয়েছে। রোগীপত্রও দেখতে পারেন না। নিজেই যে এখন রোগগ্রস্ত। কলমের ব্যবসাটাও আর করবার উপায় নেই। বেশীর ভাগ গাছই যে কাটা পড়েছে।

হজরত ক্রমে ক্রমে শয্যাশায়ী হয়ে পড়তে শুরু করলেন। সামান্য সুস্থ বোধ করলে সামনের বারান্দায় এসে বসেন চেয়ারে। ঐ পর্যন্তই। আলীশান খানকা হয়েছে। সেখানেও যেতে পারেন না তিনি। মোরাকাবা হয় বারান্দায়। সমস্ত বারান্দায় ঠাসাঠাসি করে বসেন মুরিদবৃন্দ। লোকজন বেড়ে গেছে আগের চেয়ে অনেক। প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন এসে হাজির হন হজরতের দরবারে।

অসুস্থ শরীরেও হজরত সবার সঙ্গে কথা বলেন। তরিকার সবক দেন। আগের মতো আর হাঁক ডাক করতে পারেন না। নিজে বাজারে যেতে পারেন না। তবুও ইশারায় নির্দেশ দেন আগন্তুকের আহারের বন্দোবস্ত করবার জন্য। দূর দূরান্তের মানুষ। পরিশ্রান্ত। এদিকে তাঁর শরীরে বল নেই মোটেও। কিভাবে মেহমানদারী করবেন তিনি?

কখনো কখনো আগের মতো আহারের সময় বাইরে বারান্দার একপাশে চেয়ারে বসেন তিনি। উদাস দৃষ্টি মেলে তাকান। ভেজা চোখ। দুই চোখ মমতা চকচক করে। আফসোস করে বলেন, 'কি খাও না খাও তোমরা। কিছুই দেখতি পারিনে।' কথা শুনে মনে হয়, তাঁর শারীরিক অসুস্থতা তাঁর আসল কষ্ট নয়। নিজের ফরজন্দদের নিজ হাতে খেদমত না করতে পারার কষ্টটাই তাঁর আসল কষ্ট। মনে হয়, ঐ মাটির কুটির আর মাটির খানকা হারানোর কষ্টটাই তাঁর প্রধান কষ্ট। চোখের সামনে থেকে কালুতলার স্মৃতি সরে যাওয়ার দুঃখই তাঁর আসল দুঃখ। তাই হোক। থাক সবাই এই প্রাসাদে— এই দালানে, এই মোজাইক করা বিরাট খানকায়। তিনি তো আর থাকবেন না বেশীদিন। তাঁর সাধের কুটির গেছে। মাটির উঁচু বারান্দায় রাত বিরাতে বসে থাকার সুখ গেছে। মাটির খানকায় ছেঁড়া কাঁথার উপরে বসে আরাম করার আনন্দ গেছে। আর কেনো থাকা এখানে। বনের পাখি এবার বনে চলে যাবেন। সেই পাখিদের দলে গিয়ে মিশবেন। সময় হয়ে এলো বুঝি। প্রিয় মোর্শেদ যে দলে গিয়ে মিশেছেন সেখানে যাবার আরতো বেশীদিন নেই। আর মনে হয় বেশীদিন নেই।

রোগযন্ত্রণা বেড়ে চললো। সবাই মনে করলেন ভালো চিকিৎসা প্রয়োজন। মহকুমা শহর সাতক্ষীরা। বড় ডাক্তার এখানে কোথায়?

খুলনার ভক্ত মুরিদগণ হজরতকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলেন খুলনায়। প্লাটিনাম জুবিলি জুট মিল এলাকায় অবস্থান করলেন তিনি। চিকিৎসা চলতে থাকে। মাঝে মাঝে রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। কখনো মনে হয়, এখনই বুঝি সবকিছু শেষ হয়ে যাবে।

রোগশয্যায় শুয়ে হজরতের হয়তো চিন্তা হলো, তিনি তো চলে যাবেনই। এই সুউচ্চ সিলসিলার প্রচার প্রসারের জন্য তো লোক নিয়োগ করা প্রয়োজন। যেনো তাঁর অবর্তমানেও জারী থাকে সত্য তরিকা প্রচারের কাজ। ইতোপূর্বে তিনি তিনজন প্রতিনিধি নিয়োগ করেছিলেন। প্রথম জন তো সেই স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ই শহীদ হয়েছেন। বাকী দুজন আছেন। হজরত এই দুইজনকেই যথেষ্ট মনে করলেন না। কি জানি কি মনে হলো তাঁর। কে জানে কার ভিতরে কি সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। কার মাধ্যমে যে ফুটে উঠবে এই সিলসিলার পূর্ণ রূপ, তা আল্লাহ্ আলেমুল গায়েবই জানেন? আরো লোক প্রয়োজন। অনেক লোক প্রয়োজন। যাঁর মাধ্যমে হোক, যেভাবেই হোক এই উচ্চ সিলসিলার প্রসার হোক। এ আলো ছড়িয়ে পড়ুক সবখানে— দেশব্যাপী, বিশ্বব্যাপী।

কিন্তু এযে অত্যন্ত কঠিন দায়িত্ব। প্রতিনিধি নির্বাচনে তো আবেগপ্রবণতাই মূল কথা নয়। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা খতিয়ে দেখা দরকার। আল্লাহ্পাকের ইশারা হওয়া দরকার। সব কিছু মিলিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরও ভীতসন্ত্রস্ত থাকা দরকার। নবুয়ত খতম হয়ে গেছে— অহি হয়েছে বন্ধ। উঁচু দরের বুজুর্গদের এল্কা, এলহাম সঠিক হলেও তাতো অহির মতো নিঃসন্দেহ নয়, হতেও পারে না। তাছাড়া ভবিষ্যতের জ্ঞান আল্লাহ্পাকের হাতে। কে জানে কি হবে ভবিষ্যতে? কারো যদি পদস্খলন হয়। এ পথ চুলের চেয়েও সরু। তলোয়ারের চেয়েও ধারালো। সামান্য অসতর্কতার কারণে কে জানে কখন কার পদস্খলন হবে। প্রতিনিধিত্বের হবে অবমাননা। কে জানে কাকে দাঁড়াতে হবে আসামী হয়ে শেষ বিচারের দিনে। কোনো নিশ্চয়তা নেই। খেলাফত তো নবুয়ত নয়। যদিও নবুয়তের সিঁড়িপথেই আগমন খেলাফতের। কিন্তু নবীগণ তো মাসুম (নিষ্পাপ) এবং মাহফুজ (সুরক্ষিত)। আল্লাহ্পাক কোনো নবীকেই ভুলের উপরে রাখেন না। ভুল সংঘটিত হলে আল্লাহ্পাকই তাঁদেরকে সাবধান করে দেন। সংশোধন করে দেন। কিন্তু অলিগণ তো এরকম হেফাজত থেকে বঞ্চিত। তাঁদের হেফাজত তো শর্তযুক্ত— নবীগণের মতো শর্তমুক্ত নয়। নিজ নবীর অনুসরণের কারণেই তো তাঁরা আল্লাহ্পাকের হেফাজত লাভ করেন। এই অবর্ণনীয় সূক্ষ্ম পথে স্থায়ীভাবে কায়েম থাকার জন্য আল্লাহ্পাকের দরবারে সাহায্য প্রার্থনার আবশ্যক।

হজরত অনেক লোককে খেলাফত প্রদান করলেন। মোট মাট বত্রিশ জনকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন। দুই চোখ বেয়ে প্রবাহিত হলো তাঁর অশ্রুধারা। এরা যতোই কিছু হোক না কেনো তাঁর চোখে তো সবাই শিশু। নিজের বুকের আগুন দিয়ে সবার বুকে আল্লাহ্ প্রেমের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন তিনি। বুকের ধন এরা। বুকের সম্পদ। আজ যে পাহাড়ের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হলো তাদের মাথায় কেউ যদি সে বোঝা উঠাতে অক্ষম হয়। এ বোঝা যে সব বোঝার চেয়ে বেশী ভারী। এ দায়িত্ব যে সমস্ত দায়িত্বের উপরে। হজরত কাঁদলেন অনেক। সবাইকে নসিহত করলেন বিভিন্নভাবে। একই কাজ সবার। তাই তিনি সবাইকে প্রায় একই রকম নসিহত করলেন।

একজন প্রতিনিধিকে লিখলেন তিনি –

আস্ সালামো আলাইকুম।

আল্লাহ্র পূর্ণ রহমত বর্ষিত হোক আপনাদের সকলের প্রতি। আমি খুলনায় ডাঃ খায়রুল আলম সাহেবের বাসায় চিকিৎসার জন্য প্রায় এক মাস অবস্থান করিবার পর গত পরশু বাড়ী আসিয়াছি। আমার সমস্ত শরীরে রস। ঘরের মধ্যে চলাফেরা করিলেও দম লাগে। প্রায় চলৎশক্তি রহিত অবস্থায় আমার দিন কাটিতেছে। জানি না আল্লাহ্পাক আর কয়দিন হায়াতে রাখেন। আমার যে কি কষ্ট হইতেছে তা একমাত্র আল্লাহ্ মাবুদই জানেন।

আপনাকে খেলাফত দেওয়া হইল। যতদিন 'লা তাঈন' মাকাম শেষ না হয় ততদিন আমার প্রতিনিধি স্বরূপ লোকজনকে বায়াত করাইবেন। বায়াত করাইবার সময়, "আমি আমার পীর কেবলা হজরত হাকিম আবদুল হাকিম সাহেবের প্রতিনিধি স্বরূপ বায়াত করিতেছি" এই কথার উল্লেখ করিবেন। কথায় বার্তায় চলা ফিরায় মানুষের সঙ্গে প্রতিবেশীর সঙ্গে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে ব্যবহারে স্বভাব চরিত্রে যেনো পূর্ণ শরীয়তের সৌন্দর্য বিকশিত হয়— সেই বিষয়ে সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখিবেন। লোকজনকে শরীয়ত মোতাবেক চালিত করিবেন। যাহারা বায়াত হইবে তাহাদের নাম ও ঠিকানা আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। তাহারা প্রকৃতপক্ষে আমার মুরিদান বলিয়াই গণ্য হইবে। মনে হয় আর আমার বাহিরে সফরে যাওয়া সম্ভব হইবে না। তাই তরিকা প্রচার ও প্রসারের কাজ যাহাতে অব্যাহত থাকে তাই প্রতিনিধি হিসাবে আপনাদেরকে নিযুক্ত করা হইল। মনে রাখিবেন, এ বড় কঠিন দায়িত্ব। পাহাড় মাথায় করিলে তবু স্বস্তি পাওয়া যায়, কিন্তু এই দায়িত্ব মাথায় নিলে আর স্বস্তি পাওয়া যায় না। এর জন্য জররা জররা হিসাব দিতে হইবে। যাহাদের মাকাম পূর্ণ হইয়াছে আপনি তাহাদের সবক বদল করিয়া দিবেন। দোয়া হেজবুল বাহার নিয়মিত পড়িবেন। আর কি লিখিব। ওখানকার আপনার পীর ভাইদিগকে আমার সালাম ও দোয়া বলিবেন। সবাই মিলিয়া আমার জন্য খাস করিয়া দোয়া করিবেন। আল্লাহ্পাক যদি হায়াতে রাখেন তবে আবার সাক্ষাৎ হইবে।

ইতি

হাকিম আবদুল হাকিম

বাড়ী ফিরে এসে পূর্ণ বিশ্রাম নিতে চাইলেন হজরত। ভালোই হয়েছে। দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হয়েছে এবার। একের বোঝা এখন অনেকের কাঁধে। এখন তাঁর পূর্ণ বিশ্রাম।

কিন্তু কাকে বলে বিশ্রাম। চারিদিকে যে সমস্ত প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়েছে; তাঁরাতো এখনো পরিণত নয়। অনেকেই রূহানী মঞ্জিলসমূহের শেষ প্রান্তে এখনো পৌঁছুতে পারেননি। তাঁদের প্রতি সার্বক্ষণিক রূহানী তাওয়াজ্জোহ্ রাখা দরকার। তাঁদের মাধ্যমে নতুন নতুন লোকজন তরিকায় দাখেল হচ্ছে। কাফেলার এ সমস্ত নতুন সদস্যদের সঠিক তরবিয়ত করবার জন্য নিয়মিত সবাইকে উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকেও রূহানী মঞ্জিলসমূহের শেষ পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য বিরতিহীন মোজাহেদায় লিপ্ত থাকবার জন্য উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। নতুন মানুষতো সবাই। কি করতে কি করে। তাঁর আর বিশ্রাম কোথায়?

সবারই চিন্তায় সবারই মঙ্গল কামনায় সবারই কামিয়াবির ফিকিরে তাঁকে পেরেশান থাকতে হয়। যতোদিন দুনিয়ায় আছেন তিনি, ততোদিন বিশ্রাম নিবার সময় নেই।

হজরতের রোগযন্ত্রণা পুরোপুরি নিরাময় হতে চায় না। কখনো কতকটা সুস্থ বোধ করেন। আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। শরীরে বল নেই। পুকুরে গোসল করা তাঁর খুব পছন্দ। এখন আর পুকুরেও যেতে পারেন না। বারান্দায় তোলা পানিতে গোসল করে নিতে হয়।

কোনো ভক্ত মুরিদ বালতিতে করে পানি নিয়ে আসেন। তাঁকে গোসল করিয়ে দেন। একেবারে শিশুদের মতো তিনি নিজেকে সমর্পণ করেন তাঁর খেদমতে রত মুরিদের কাছে। এরকম আদর যত্ন তাঁর খুব পছন্দ। মনে হয় তিনি চান, সবাই তাঁকে এরকম, একেবারে আপন জনের মতো ভালোবাসুক— আদর যত্ন করুক। কখনো শাসনও করুক।

হজরত কখনো বলতেন 'মহব্বত হয়ি গেলে মাথা পা সব সমান হয়ি যায়।' অর্থাৎ আল্লাহ্র ওয়াস্তে যখন প্রকৃত মহব্বত হয়ে যায় তখন বাইরের আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন গৌণ হয়ে পড়ে। তখন পীর মুরিদ সবাইতো একই প্রেমের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে যান। পারস্পারিক আলাদা অবস্থান আর কোথায়। প্রত্যেকেই যে একমাত্র আল্লাহ্র প্রেমে নিজেদের সবকিছু করেছেন কোরবানী। এমন কি নিজেদের অস্তিত্বেও।

হজরত এবার শুরু করলেন আর এক কাজ। নিজের কবর নিজেই নির্মাণ করবার উদ্দ্যোগ নিলেন তিনি। নিজেকে প্রকাশ করার ইচ্ছা হজরতের ছিলো একেবারে অপছন্দনীয়। একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, আপনার লিখিত চিঠিপত্র যা বিভিন্ন মুরিদগণের নিকট লেখা হয়েছে সে সমস্ত সংকলিত করে আমরা মকতুবাতে 'হাকিমিয়া' বা 'মকতুবাতে আবদুল হাকিম' নাম দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে চাই।' হজরত জবাব দিয়েছিলেন, 'আমি মরি গেলে করো।'

নিজের জীবদ্দশায় নিজের পরিচিতির জন্য, নিজের খ্যাতির জন্য কোনোকিছুই করেননি তিনি। বরং অন্য কেউ করতে গেলে তাকে প্রবলভাবে বাধা দিয়েছেন। প্রথমদিকে দূরবর্তী মুরিদগণকে চিঠি লিখবার জন্য তাগিদ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বলতেন তিনি, 'খবরদার আমার নামের আগে পীর সাহেব লিখবেন না। শুধু নাম লিখবে খামের উপরে।'

অথচ হজরত আজ নিজেই নির্মাণ করতে শুরু করেছেন নিজের মাজার। উপরে গম্বুজ হবে। অন্যান্য অলি আল্লাহ্গণের মাজার যে রকম হয় তেমনই সুন্দর করে তিনি নির্মাণ করতে শুরু করলেন নিজের কবর নিজেই। কি হেকমত এই কাজের কে জানে। আল্লাহ্পাকের অলিগণের কিছু কাজ এরকমই। আপাত দৃষ্টিতে যার অর্থ বোঝা যায় না।

আস্তে আস্তে মাজার তৈরীর কাজ সম্পন্ন হতে থাকে। বারান্দা থেকে মাজার দেখা যায়। হজরত বারান্দায় চেয়ারে বসে দেখেন। নিজেরই উদ্যোগে নির্মীয়মান নিজের মাজারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন এক দৃষ্টিতে।

খানকার পশ্চিম দেয়ালের পাশ ঘেঁষে মেহরাবের বাইরের দিকে মাজার তৈরী হয়েছে। মাজারের পশ্চিম পাশে সারিবদ্ধ কয়েকটা সুপারী গাছ। মাজারের গম্বুজের উপর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে গাছগুলো। পূর্ব পাশেও আছে অল্প কয়েকটা গুবাক তরু। দূর থেকে দেখলে মনে বিস্ময়কর ভাবের উদয় হয়।

গুবাক তরুর তলে গম্বুজ রওজার।
নূরে নূরময় বরকতময় মোবারক দরবার।

হজরত নিজের মাজার নিজেই দেখেন। ভাবান্তর হয় তাঁর মনে। কি মনে হয় কে জানে। কথাবার্তা কমে গেছে একেবারে। দীর্ঘ সময় কেটে যায় মৌনতায়।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিদিনই লোকজন আসে হজরতের জেয়ারতের জন্য। তিনিতো আর সফরে যেতে পারবেন না এখন। তাই সবাই আসবার চেষ্টায় থাকেন সাতক্ষীরায়। প্রিয় মোর্শেদের মোবারক চেহারা দর্শনের জন্য উন্মাতাল হয়ে ছুটে আসেন আশেকের দল। মোবারক সহবতের প্রভাবে ঠিকানা পান নতুন মঞ্জিলের। সবাই দেখেন, মাজার উঠেছে। গুবাক তরুর ছায়ায় হজরত তৈরী করেছেন তাঁর নিজের কবর। তবুও প্রতিক্রিয়া হয় না কারো। যেনো তাদের নিজের মোর্শেদ ছাড়া অন্য কোনো দিকে নজরই নেই। ভুলে যান তাঁরা, মোর্শেদ ছেড়ে যাবে তাঁদের। অনেকে ভাবেন, এখনো অনেক বাকী আছে কাজ। কেবল কচি জামাত। কচি কিশলয়ের মতো। এ জামাত মজবুত হবে তারপর তো? ফরজন্দগণকে পথে রেখে কি তিনি যেতে পারেন?

হজরত বারান্দায় বসেন সবাইকে নিয়ে। দূরের কাছের তালেবে মওলাগণ ঘিরে বসেন তাঁকে। তাঁদের সঙ্গে হজরত কখনো কিছু কথা বলেন। মোরাকাবা করেন সবাইকে নিয়ে আবার কখনো একবারে স্থির হয়ে যান পাহাড়ের মতো। নীরব নিথর পরিবেশে কখনো কেটে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। হজরতের মুখে কোনো কথা নেই। নীরব নিথর তিনি। শুধু চোখ দুটোতে অজানা কোনো এক রহস্যময় জগতের কি সব অবোধ্য দৃশ্যাবলী ভেসে ওঠে। কে করতে পারে সে সমস্ত রহস্যময় অবস্থার সঠিক অনুবাদ? কে?

হজরত কখনো হয়তো মুখ খোলেন। বলেন কাউকে, 'কবরের দিকে গিইলে? দেখিছ? আমি এখনো দেখিনি। মনে করেছি একবার দেখব।'

এভাবেই কেটে চলে দিন। সাতক্ষীরাতে বসেই তিনি সব স্থানের সংবাদ রাখেন। এজাজত প্রাপ্ত প্রতিনিধিগণকে বিভিন্ন নির্দেশ প্রদান করেন। রূহানীভাবে সহযোগিতা প্রদান করেন। যেনো তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই এক একজনকে এই উচ্চ সিলসিলার এক একজন শক্তিমান সৈনিক হিসাবে সাজিয়ে যেতে চান।

বিভিন্ন স্থান থেকে সংবাদ আসে। বিভিন্ন স্থানে তালেবে মওলাগণের সংখ্যা বেড়ে চলে দিন দিন। নতুন নতুন আশেকের দল বার্ষিক মহফিলের সময় এসে দরবার সরগরম করে তোলে। হজরত হয়তো ভাবেন, এদের জন্যই তো ভাবনা তাঁর। এই নতুন আশেকদের পথ নির্দেশনার জন্যইতো তিনি লোক তৈরী করে রেখে যেতে চান সবখানে। যাদেরকে রেখে যেতে চান রাহবার হিসাবে তাঁদেরকে পূর্ণতার শিখরে উন্নীত করতে পারলেই আর ভাবনা থাকবে না। নিশ্চিন্তে তিনি মাশুকের দাওয়াত কবুল করতে পারবেন। কে জানে আর কদিন সময় আছে হাতে।

দুই বছরেরও বেশী সময় কাটলো এভাবে।

হজরত মনে হয় এবার স্বস্তি পেতে শুরু করলেন অনেকখানি। বেশ কয়েকজন ইতোমধ্যেই পূর্ণতার শেষ প্রান্তে উপনীত হতে পেরেছেন। কাউকে জানালেন শুভসংবাদ 'আল্লাহ্পাকের শোকর আজ তোমাকে যাবতীয় তরিকত শেষ করাইতে পারিলাম।'

এবার তৈরী হতে হবে। আখেরী সফরের সময় আগত। বিভিন্ন স্থানে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে অতন্দ্র প্রহরী, নতুন নকীব, দ্বীনের সৈনিক। আল্লাহ্পাক সাহায্য করুন সবাইকে। হেফাজত করুন। বিজয়ী করুন।

হজরত তাঁর শেষ বার্ষিক মহফিলে প্রচলিত একটি নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটালেন। বার্ষিক মহফিলের আখেরী মোনাজাত তিনি নিজেই পরিচালনা করতেন সব সময়। কিন্তু তার ব্যতিক্রম হলো শেষ মহফিলে। মোনাজাতের আগে ডাকলেন একজনকে। বললেন, 'তুমি দোয়া করো।'

তাই হলো। শেষ মোনাজাত পরিচালনা করলেন আর একজন। তিনিও হাত তুললেন সবার সাথে। মনে হয় তিনি এবার প্রকাশ্য দৃশ্য থেকে অন্তরালে চলে যেতে চান— নেপথ্যে সরে যেতে চান।

মহফিল শেষে বললেন, 'ঢাকা যাবো। এবার কোনো ভালো ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করাবো। মনে হয় কিছুদিন থাকতে হবে ঢাকায়।'

মহফিলের একদিন পরেই তিনি চলে এলেন ঢাকায়। বড় ডাক্তার দেখানো হলো।

ডাক্তার দেখলেন, বৃদ্ধ এই বুজর্গের শারীরিক দুর্বলতা অত্যধিক। পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন তাঁর।

এখানে প্রতিদিন বিকেলের দিকে মুরিদগণ এসে জড় হতেন তাঁর কাছে। এখানেও তিনি তাঁর মোরাকাবা মহফিল চালিয়ে যেতে থাকলেন। বাদ মাগরিব সবাইকে নিয়ে বসেন। কষ্ট হয়। হাঁফ লাগে। তবুও প্রিয় ফরজন্দগণ ছাড়া থাকতে পারেন না তিনি। কোনো কোনো দিন বেশী কষ্ট হলে কাউকে বলেন, 'তুমি মোরাকাবা করাও।'

ডাক্তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপত্র দিলেন। পূর্ণ বিশ্রাম নিবার পরামর্শ দিলেন। বললেন, 'একা থাকা প্রয়োজন। লোকজন যেনো হুজুরের কাছে না আসে।' কিন্তু

ডাক্তারের নির্দেশ মানা সম্ভব হলো না হজরতের পক্ষে। কি করে একা থাকবেন তিনি। তাঁরা সারা জীবনের বুকে গড়া সম্পদ, পেয়ারা ফরজন্দদেরকে না দেখে কি করে থাকতে পারবেন তিনি। সবাই দেখা করতে এসে বসে থাকবে বাইরের বারান্দায়। আর তিনি ঘরে থাকবেন একা? তাই কি হয়?

হজরত নিজেই বারান্দায় এসে চেয়ারে বসেন। বলেন মৃদু হেসে, 'তা ডাক্তার আমার কাছে তোমাদের আসতে বারণ করেছে। তোমাদের কাছে তো আমাকে আসতে বারণ করেনি। কি বলো।'

সবাই খুশি হয়। ইশকের মহফিল মুখর হয়। নূরের অনন্ত প্রস্রবণে নিমজ্জিত হয়ে সবাই নিশ্চিন্ত হয়। বিলীন হয়ে যায় পিছনের স্মৃতি।

রাত হয়। হজরত তাগিদ দেন সবাইকে নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে যাবার জন্য। সবাই ফিরে যায়। ভাবে, আগামীকাল তো আসার সুযোগ হবে আবার।

প্রায় পনের ষোলো দিন কেটে গেল এভাবে। রোগ নিরাময়ের তেমন কোনো লক্ষণ নেই। তবে পূর্বের তুলনায় সামান্য উপশম হয়েছে বলে মনে হয়। আর কতোদিন? এবার বাড়ী ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেলেন হজরত। হয়তো বুঝেই ফেললেন, চিকিৎসায় আর কাজ হবে না। মন কেমন যেনো হয়ে যায়। কি এক রহস্যঘেরা জগতের হাতছানি নজরে আসে। কি এক আনন্দ। কি এক যন্ত্রণা।

বাড়ী ফিরে এলেন হজরত। সেই দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকার ভাবটা ইদানিং আরো প্রবল হয়েছে। রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পেলে যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন। কখনো। আবার কখনো বারান্দায় চেয়ারে বসে নীরব দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন কার দিকে, কোনো অদৃশ্য জগতের দিকে কে জানে? অনেক সময় এমন হয়, অতি কাছের লোকজনকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পরও চিনতে পারেন না তিনি। কখনো সামনে বসে থাকা নিজের সন্তানকে দেখেও প্রশ্ন করেন 'কেডা ও।' জবাব পেলে চিনতে চেষ্টা করেন। এ জগতের খেয়াল একটু প্রবল হলে চিনতে পারেন। বলেন 'ও-তুমি, কখন এয়েচো।'

আল্লাহ্ প্রেমিকগণ তো এরকমই। আল্লাহ্র অলি তো আল্লাহ্রই অলি। অন্য কারো সঙ্গে কি আর এতো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্ভব? যিনি আল্লাহ্ প্রেমের তলোয়ার দিয়ে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি কি আর কারো? তিনি কারোর পিতা হলে কি, সন্তান হলে কি, আল্লাহ্র জন্যই তো তিনি মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন। সম্পর্কধারী ব্যক্তি আওলাদ হোক বা না হোক। আত্মীয় হোক বা না হোক— আল্লাহ্ওয়ালা হলেই হয়। আল্লাহ্ওয়ালা না হলে রক্তের বাঁধন, রক্তের সম্পর্কতো কোনো সম্পর্কই নয়।

দেখতে দেখতে জিলহজ্ব মাস এসে যায়। বিছানায় শুয়ে শুয়েই কাটে তাঁর সময়। চলা ফেরা করা কষ্টদায়ক ব্যাপার। আর কতোদিন প্রতীক্ষায় থাকতে হবে? প্রেমাস্পদের জ্যোতির্ময় বদনের কালো নেকাব উন্মোচিত হবে কবে?

মনে হয়, কিসের যেনো নিঃশব্দ আওয়াজ ভেসে আসে কানে। কারা যেনো তাঁর অপেক্ষায় সময় গুণছে। রূহানী জামাতের সেই সমস্ত নূরানী ব্যক্তিগণের শব্দহীন পায়ের আওয়াজ শোনা যায় যেনো। কে ডাকে? আমিনউদ্দিন? পিতা? মোর্শেদ? কে কথা বলে? শাহজানপুরের সেই দীর্ঘদেহী আশেক— সেই প্রেমময় মুফতী? কে চেয়ে থাকে প্রতীক্ষায়? সেরহিন্দের সিপাহ্সালার হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি (রঃ)? কোথাকার সুরভি মাতাল করে দেয় চারিধার— বোখরার, মা অরা উন্নাহারের, গজদেওয়ানের, হামাদানের, বোস্তামের, খেরকানের? কে দিয়েছে নূরের দু'হাত বাড়িয়ে? প্রবাসী আশেককে আলিঙ্গনাবদ্ধ করতে ব্যাকুল হয়েছে কে? মোহাম্মদ সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। রসূল? সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। উম্মতের কাণ্ডারী? সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

এতোকিছু নেয়ামতে পরিপূর্ণ হবার পরেও শেষ সময়ের দিকে হজরতের খওফে এলাহীর (আল্লাহভীতির) হাল প্রবল হলো। তাই হয়। আল্লাহ্পাকের দরবারে যাঁর যতো উচ্চ মর্যাদা হাসেল হয়, তাঁর ভয়ভীতিও হয় ততো বেশী।

হজরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ্পাকের আজমত কিবরিয়াইর চিন্তায় ও ভয়ে অস্থির হয়ে যেতেন। পাখি দেখলে বলতেন, আহা তুমি কতো সুখী। গাছের ডালে নেচে খেলে বেড়াও। তোমাকে আল্লাহ্পাকের নিকট জবাবদিহি করবার জন্য দাঁড়াতে হবে না। কখনো গাছ দেখে বলতেন, 'আহা আমি যদি গাছ হতাম। তবে তো আল্লাহ্পাকের নিকট নিজের হিসেব দাখেল করতে হতো না আমাকে।

হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) একবার ঘোড়ায় চড়ে এক বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। বাড়ীর ভিতর থেকে কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ আসছিলো। আল্লাহ্পাকের গজব সংক্রান্ত সেই আয়াত শুনে হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) ভয়ে অস্থির হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। তারপর তিন দিন ধরে পরে থাকলেন অসুস্থ হয়ে।

ঈদের দিনে যখন তিনি অঝোর ধারায় কাঁদতেন তখন কেউ কারণ জিজ্ঞেস করলে বলতেন, 'আহা সবাইতো জেনেছে আল্লাহ্পাক তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাইতো সবাই খুশী। কিন্তু ওমর জানবে কিভাবে তাকে ক্ষমা করা হলো কিনা?

এরকমই হয়। পূর্ণ মারেফত অর্জনকারী ব্যক্তিগণের চিন্তা চেতনা এরকমই। তাঁরা জানেন আল্লাহ্পাকের আজমত (মহত্ব) কিবরিয়াই (উচ্চতা) কতো উচ্চ। তাঁর উপযোগী ইবাদত করার ক্ষমতা কি কারো আছে? তাঁর উপযোগী প্রশংসা করার ক্ষমতা কি কারো আছে?

হজরতের খওফে এলাহীর (আল্লাহ্ভীতির) অবস্থা প্রবল হলে তিনি বলতেন কখনো কোনো মুরিদকে, 'মওলানা সাহেব আমাকে তওবা পড়িয়ে দিন। পাপী মানুষ।'

হিজরী শতাব্দীর শেষ বছর। শেষ বছরের শেষ মাস। জিলহজ্ব। এ মাসেরই বিশ তারিখে আল্লাহ্পাক নির্ধারণ করলেন হজরতের মাশক মিলনের লগ্ন। সোমবার। এইবারে তিনি তাঁর হাবীব মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে কবুল করে নিয়েছিলেন। তাঁরই ইশকের আগুনে তুর পর্বতের মতো ভস্মীভূত হজরত হাকিম আবদুল হাকিমকে আল্লাহ্পাক তুলে নিলেন দুনিয়া থেকে এই সোমবারেই। দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হয়েছে। হজরত বিছানায় শুয়ে আছেন আচ্ছন্ন অবস্থায়। আল্লাহ্ প্রেমের নেশায় সমস্ত সত্তা মোহাবিষ্ট। দীদারে জামালের উদগ্র প্রতীক্ষায় তৃষ্ণার্ত পাখি— অনন্ত জগতের অন্তহীন নীলিমায় এবার উড়াল দিতে চায়। সময় হলো কি?

তখন প্রায় পৌনে চারটা বাজে। হজরত উঠে বসলেন। তৃষ্ণার্ত মনে হয় নিজেকে। পানি খেতে চাইলেন। পানির গ্লাস ধরা হলো সামনে। সামান্য পানি পান করলেন তিনি। তারপর শুয়ে পড়ে পুনরায় মোরাকাবায় নিমগ্ন হলেন। দুই চোখের পাতা বন্ধ হয়ে গেলো। মাশুক, মাশুক। হে পরম বন্ধু। চিরদিনের জন্য হজরত মোরাকাবায় নিমগ্ন হয়ে গেলেন। কোনোদিনও সে ধ্যান ভাঙলো না আর। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইলাইহি রজিউন।

বিভিন্ন স্থানে সংবাদ পাঠানো হলো সবাইকে। ছুটে এলেন সবাই। বুকের সম্পদ, পেয়ারা ফরজন্দগণ যে যেখানে আছেন সবাই এসে জড় হতে লাগলেন সাতক্ষীরায় হজরতের শেষ জেয়ারতের আশায়।

সবাই প্রাণভরে দেখতে থাকলেন হজরতকে। আহা আরতো দেখতে পাওয়া যাবে না কোনো দিন। এই নেসবতে সিদ্দিকীর ক্ষণজন্মা কুসুম আরতো কখনো দল মেলে হাসবে না এই বাগানে। আর কে অমন কলিজার দরদ দিয়ে দোয়া করবে, 'ইয়া আল্লাহ্ আমাদেরকে গফেল রেখো না তোমার বন্দেগী হইতে গাফেল রেখো না গাফেল রেখো না। দেশবাসীকে হেদায়েত করো। আরতো কেউ বলবে না, 'খরবদার খরবদার চিঠি দিতে ভোলবেন না যেনো।'

সবাই শোকাচ্ছন্ন। কেউ শোনালেন, আল্লাহ্পাকের এরশাদ 'অলা তাকুলু লি মাঁইইকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত বাল আহ্ইয়াউ ওয়ালা কিল্লা তাশউরূন।' 'যারা আল্লাহ্পাকের পথে জীবনপাত করেছে তাঁদেরকে তোমরা মৃত বলিও না।'

সান্ত্বনা পায় হয়তো কেউ কেউ। তাইতো। প্রিয় মোর্শেদ। মহান মোর্শেদ তো মৃত্যুহীন জীবন লাভ করেছেন। তিনি তো মৃত নন। মৃত্যুঞ্জয়ী।

কিন্তু তবুও ফাঁকা ফাঁকা লাগে। প্রত্যেকের হৃদয়ে মনে বিরাজ করে কি এক শূন্যতা। কি কথা শোনার জন্য যেনো সকলের অবচেতন মন উন্মুখ হয়ে আছে। এযে সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) এর সিলসিলা। তাঁর অনুকরণে কারো কণ্ঠে কি ধ্বনিত হবে সেই আয়াতের প্রতিবিম্বজাত মর্মার্থ— যে আয়াত শরীফ রসূলেপাক (সঃ) এর ইন্তেকালের পর মসজিদে নববীতে সাহাবাগণকে শুনিয়েছিলেন হজরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) স্বয়ং।

'অমা মোহাম্মদুন ইল্লা রসূল .....' (মোহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল ব্যতীত অন্য কিছুতো নন। তাঁর পূর্বে বহু রসূল গত হয়েছেন। সুতরাং যদি তাঁর মৃত্যু হয় অথবা তিনি নিহত হন তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহ্র ক্ষতি করতে পারবে না বরং আল্লাহ্ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন)।

আজ যে শোক প্রকাশের দিন নয়। কর্তব্যবোধে উজ্জীবিত হবার দিন। প্রিয়জনের বিচ্ছেদ ব্যথায় মুষড়ে পড়ে স্থবিরতার কাছে আত্মসমর্পণ আজ নয়। কর্তব্যকর্মে ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা দরকার। হজরতের প্রেমের প্রজ্বলিত মশাল নিয়ে নতুন প্রস্তুতির প্রয়োজনে কার কণ্ঠে ধ্বনিত হবে এবার—

আমরা তো আজও তোমারই নিশান নিয়ে
বন্ধুর পথ জুলমত ডিঙ্গিয়ে
চলেছি চলবো আজীবন অবিরাম;
তোমারই মতো ভালোবাসা ভালোবাসা
ছড়াবো ভুবনে মনে শুধু এই আশা
গৃহে গৃহে দিব ইশকের আঞ্জাম।

হজরত রসূলেপাক (সঃ) ইন্তেকাল করেছিলেন সোমবারে। দাফন হয়েছিলেন বুধবারে। হজরত হাকিম আবদুল হাকিমের ক্ষেত্রেও তাই হলো। সোমবার ইন্তে কাল করলেন তিনি। বুধবার হলো তাঁর দাফন।

বুধবার। বাইশে জিলহজ্ব। বাদ জোহর রেজিস্ট্রি অফিস ময়দানে অনুষ্ঠিত হলো জানাজার নামাজ। হজরতের সন্তান সন্ততি, প্রতিনিধিবৃন্দ, কলিজার সম্পদ রূহানী ফরজন্দবৃন্দ সবারই সম্মিলিত বিরাট জামাত শেষ শ্রদ্ধা জানালেন হজরতকে। প্রাণ প্রিয় মোর্শেদ। মহান মোর্শেদ। পাপিষ্ঠ ব্যক্তিদের আশ্রয় স্থল। শারাবান তহুরার সাকী। বিদায়। শেষ বিদায়ের সময় কি দিবো উপহার? কি আছে আমাদের? এই কলুষিত কলিজা নিয়ে যাও। তোমার মহাকাশের চেয়েও উদার কলিজা দিয়ে যাও। পরস্পর কলিজা বদলের মধ্য দিয়েই সমাপ্ত হোক আজকের এই বিচ্ছেদের মর্ম বিদারক মহফিল।

ব্যথায় বিদীর্ণ কতো আশেকের হৃদয়ের বীণা আজ কতো মর্সিয়া রচনা করে চলেছে। কতো কাসিদার অশ্রুতে প্লাবিত হয়েছে বুকের ব্যাকুল বাগান। হারাবার পরেই তো সম্পদের মূল্য বুঝতে পারে মানুষ। বিচ্ছেদের পরেই তো প্রেমিক সম্প্রদায় বুঝতে পারে প্রেমের মূল্য কতোটুকু। তাইতো বিরহ মিলন নিয়েই জীবন। যন্ত্রণা আনন্দ নিয়েই প্রেম।

কাজ শেষে চলে গেছো মাশুকের কাছে
যেথায় মিলন শুধু প্রেমের নহরে
খুঁজে খুঁজে ফিরি আজ হারাবার পরে
মিলনে বিরহে যেথা সেতু রচিয়াছে।

তারপর শেষ দৃশ্য। নিজ হাতে অন্তরাল করে দেওয়া নিজেরই জীবন। মাটির কবর। মাটির মানুষের শেষ ঠিকানা। শেষ শান্তি। শেষ বিজয়। নিজ হাতে নেকাব টেনে দেওয়া মাশুকের মুখাবয়বের উপর।

বেলা তখন ঢলে পড়েছে অনেক। পশ্চিম পাশ দিয়ে অস্তগামী সূর্যের কিরণ এসে পড়েছে হজরতের মুখের ওপর। কাফনের কাপড় সরানো হলো। দেখুক। সবাই শেষ বারের মতো দেখে নিক আল্লাহ্পাকের এই বিরল নিদর্শন চৌদ্দ শত হিজরী শতাব্দীর শেষ মুসাফির। দীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম করে বিজয়ীর বেশে এবার প্রবাসী প্রেমিক প্রত্যাবর্তন করছেন মনজিলে।

সূর্য তখনো আকাশে। এদিকে আর এক নূরের সূর্য ঢেকে দেওয়া হলো মাটির আড়ালে। সবাই মাটি হাতে নিলেন। কলিজা বিদীর্ণ করা প্রেমাবেগে মাটি ছড়িয়ে দিলেন সবাই প্রাণপ্রিয় মোর্শেদের রওজায়।

সময় বয়ে চলে।

মহাকালে অস্তিত্ব হারায় অতীত, বর্তমান। স্মৃতি থাকে সজাগ। স্মৃতির পর্দায় আজও অম্লান সেই পবিত্র মুখচ্ছবি। বিশে জিলহজ্ব ঘুরে ঘুরে আসে। হৃদয় আকুল হয়। বছরের বিভিন্ন সময়ে দূর দূরান্ত থেকে আশেকের দল ছুটে যান গুবাক তরুর তলের সেই ছায়াঢাকা রওজায়। মনের অব্যক্ত যন্ত্রণা প্রশ্ন তোলে, 'বলোনা মাশুক বলোনা কেমন আছো?

গুবাক তরুর তলে গম্বুজ রওজার
নূরে নূরময় বরকতময় মোবারক দরবার
খাকের খাঁটি বিছানায় শুয়ে জানিনা কিরূপে আছো?
বিরহ ব্যাকুল বুকের বহ্নিবাগে
তোমারই স্মৃতি বার বার শুধু জাগে
বলোনা মাশুক বলোনা কেমন আছো?

এখানে বাতাস ধীর। আশেকের কানের কাছে বাজে কতো কথা কতো স্মৃতি। এখানকার আকাশে বাতাসে প্রতিনিয়ত যেনো অনুরণিত হয়, 'আমি পীর মুরিদি করিনে। আমি চাই দ্বীনের প্রসার..

চারিদিকে প্রাসাদাক্রান্ত পরিবেশ। যেনো কোনো কণ্টক বৃক্ষ। গোলাপ গাছের মতো যেনো। কাঁটায় কাঁটায় ঘেরা গাছ। তার মাঝে পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত যেনো কোনো চির অম্লান চিরসুবাসিত অচিন গোলাপ তাঁর নিজের স্বভাবমতো সুরভি ছড়িয়ে চলেছে সারাক্ষণ। আল্লাহ্ প্রেমের অপার্থিব সুরভি।

তুমিতো মোর্শেদ মহান □ মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

ISBN 984-70240-0036-1